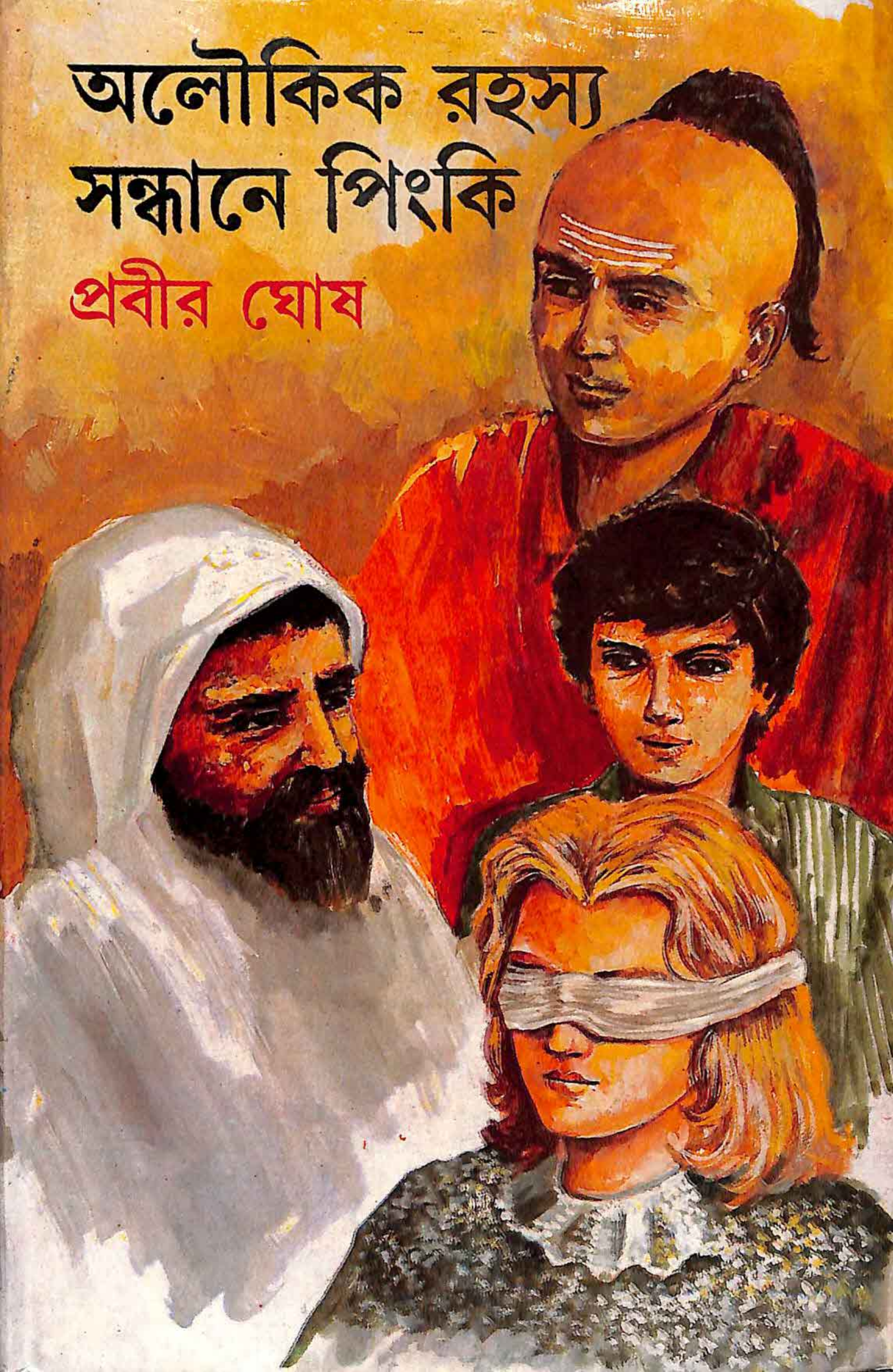
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি

প্রবীর ঘোষ



অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি

অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৮, এপ্রিল, ১৯৯১

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

অলংকরণ : দেবদত্ত নন্দী ও পিনাকী ঘোষ

দাম : ২৫ টাকা

Rupees : Twenty Five only

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে : দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট : কলকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : তাপস হাটাই : নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গী

জ্যোতিদা

দেবু

রঘু

চির

কমল

শশাংক

উজ্জ্বল

সমীর

অশোক

সেন্টুদা

ও

সীমা'কে

অভিনন্দন, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাসহ

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

অলৌকিক নয়, লৌকিক (প্রথম খণ্ড)

অলৌকিক নয়, লৌকিক (দ্বিতীয় খণ্ড)

পিংকি ও অলৌকিক বাবা

বিশ্ব-ক্যুইজ

অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি

নাটক করার অনুমতি নিতে

অথবা

অলৌকিক কিছুর ব্যাখ্যা পেতে একটি জবাবী খামসহ

লিখুন এই ঠিকানায়

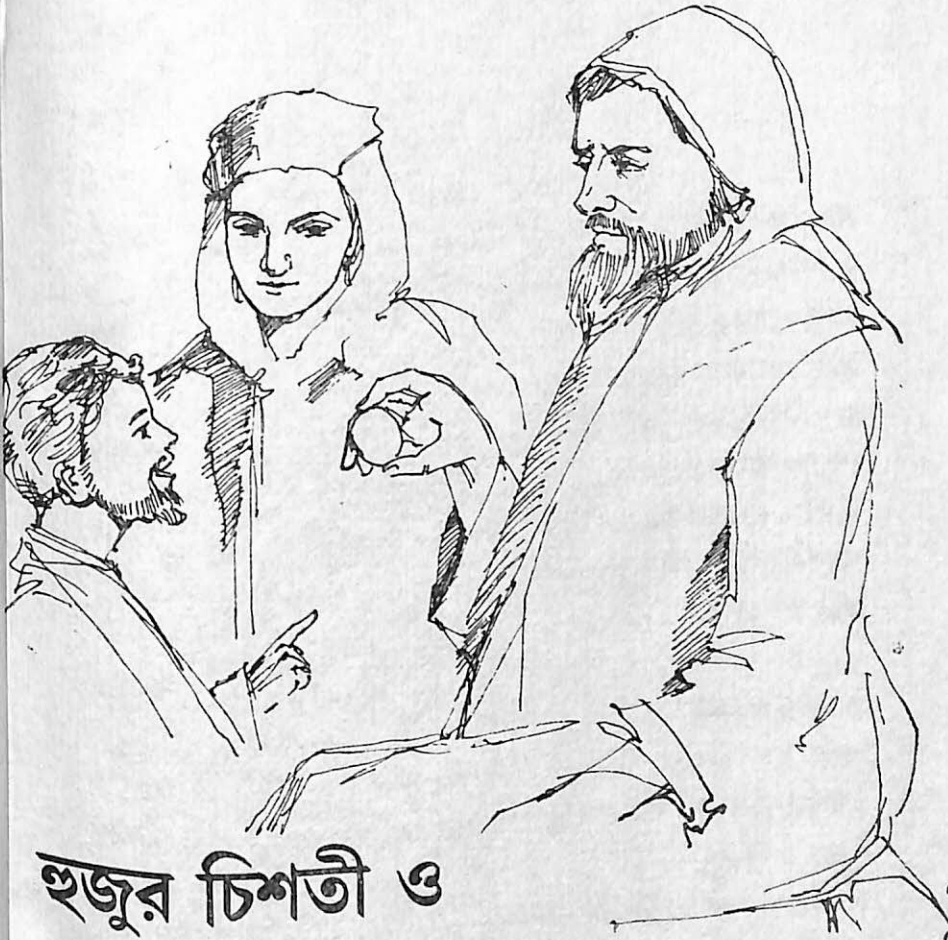
প্রবীর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

৭২/৮ দেবীনিবাস রোড

কলকাতা ৭০০০৭৪



হুজুর চিশতী ও মন্তরে ডিম সেদ্ধ



২২ ডিসেম্বর ১৯৮৯

'কু-র-র', 'কু-র-র' শব্দে ফোনটা বাজছিল। পিংকি সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। ওদের দেড়টায় ছুটি। এখন দুটো। স্কুলের পোশাক না ছেড়েই ডিভানে শুয়ে বুকের ওপর পোষা কাছিম কুসুমকে নিয়ে আদর-টাদর করছিল। কাছিমের পিঠে অয়েল-কালারে নানারকম চিত্র-বিচিত্র করা। পিংকিরই কাজ এ-সব। হঠাৎ পিঠে সুড়সুড়ি অনুভব করল পিংকি। পিঠের তলায় হাত ঢুকিয়ে বের করল 'কালিয়া'কে। কালিয়া পিংকির পোষা কালনাগিনী। মাস আটেক হলো এ-বাড়িতে আছে। দিয়েছিলেন নির্মলদা। নির্মলদা যুক্তিবাদী সমিতির ঠাকুর-নগর শাখার সদস্য। পেশায় সাপুড়ে। বাড়িতে গোটা ষাটেক নানা জাতের সাপ পুষেছেন।

এক হাতে কালিয়াকে ধরে আর এক হাতে রিসিভারটা তুলল পিংকি। কালিয়া বড় ছট্‌ফট্ করছিল। হাতের মুঠিটা একটু ঢিলে করে দিতেই সর-সর করে পিংকির গা বেয়ে ঢুকে গেল শার্টের পকেটে।

"হ্যালো ?"

ও প্রান্ত থেকে উজ্জ্বলদার উত্তেজিত গলা শোনা গেল, "আনন্দদা আছেন ?"

"না নেই। কে বলছো, উজ্জলদা ?"

পিংকির বাবা কমন 'দাদা'। পিংকির বন্ধুরাও যেমন আনন্দদা বলে ডাকে, তেমনই বাবার চেয়ে অনেক বয়স্করাও ডাকেন আনন্দদা বলে।

"হ্যাঁ। আনন্দদার অফিসে ফোন করেছিলাম, বলল, আজ আসেননি। ভাবলাম বাড়িতেই পেয়ে যাব।"

"আজকাল" পত্রিকা অফিসে যাওয়ার কথা। একটা লেখা শেষ করবেন ওখানে বসে। সেখান থেকে দে'জ পাবলিশিংয়ে যাবেন। এই

তো জানি। এক মিনিট ধর। ক'টায় ফিরবেন কিছু বলে গেছেন কি না জিজ্ঞেস করছি।"

কালিয়াকে পকেট থেকে বের করে মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে রিসিভারের মুখটা হাতের তালুতে চাপা দিয়ে পিংকি চেঁচাল, "মা, বাবা কটায় ফিরবে কিছু বলে গেছে?"

"একটু আগে ফোন করেছিল। জানিয়েছে চারটে নাগাদ ফিরবে। অ্যাসোসিয়েশনের কেউ ফোন করলে তাকে চারটের পর অবশ্যই এখানে আসতে বলেছে।" রান্নাঘরে নতুন এক রকম রান্নায় ব্যস্ত প্রীতি মনোযোগের সঙ্গে ফ্রাই প্যানে মশলাগুলো কতটা ভাজা হয়েছে দেখতে দেখতে চেঁচালেন।

পিংকি খবরটা উজ্জ্বলদাকে রিলে করতেই ও প্রান্ত থেকে আর এক প্রস্থ উত্তেজিত স্বর ভেসে এলো, "আনন্দদা আজকের 'বর্তমান'টা পড়েছেন কি না জানো?"

"উঁহু, কী আছে বর্তমানে?"

"দারুণ খবর। ঢাকার দরবার শরীফ হুজুর আনোয়ার চিশতী কাল কলকাতায় আসছেন। উঠছেন আমাদেরই হোটেলে।"

উজ্জ্বল পার্ক স্ট্রিটের হোটেল বেঙ্গল-এ কাজ করছে মাস সাতেক হলো। হোটেল ম্যানেজমেণ্ট কোর্স শেষ করে গত চার বছরে ছ'টা হোটেলে কাজ করেছে। এটা সপ্তম হোটেল।

বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা আসে পিংকিদের বাড়িতে। তাই হুজুর আনোয়ার চিশতীর নামের সঙ্গে পিংকি অতি পরিচিত। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাগুলো গত চার বছরে ওঁর জন্য যত নিউজপ্রিণ্ট খরচ করেছে, তাঁর ভগনাংশও অন্য কোনও পীর বা অলৌকিকবাবার জন্য খরচ করেনি।

পিংকি বলল, "আমরা তো 'বর্তমান' রাখি না, তাই খবরটা জানতাম না। তবে বাবা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খবরটা পেয়ে গেছেন!"

"আমি 'বর্তমান'টা নিয়ে চারটের মধ্যে তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি। আনন্দদা ফিরলে বলে রেখো।"

"রাখবো।"

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই ঘরে ঢুকলেন পিংকির মা প্রীতি। চল্লিশ ছুঁইছুঁই। যোগ ব্যায়াম, শরীর পরিচর্যার কল্যাণে বয়সটা অনেক কম মনে হয়। চাকরি না করলেও ব্যস্ত মহিলা। 'সুর-সঙ্গম'-এ গান শেখান। বাড়িতেও মেলা ছাত্র-ছাত্রী। এরই মাঝে রূপচর্চা, রান্না-বান্না ইত্যাদি নিয়ে লেখেন পত্র-পত্রিকায়, ফাংশনে গাইতে যান। আনন্দবাবু ও পিংকি ভণ্ডদের ভণ্ডামী ফাঁস করে ভালই করছে, এটা বর্তমানে মেনে নিলেও, সব সাধু-সন্তরাই হয় ভণ্ড, নয় মানসিক রোগী—ওদের এই ধরনের বক্তব্যকে আদৌ মানতে রাজী নন। দু'হাতে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "কে ফোন করেছিল রে?"

"একটা মোস্ট ইণ্টারেস্টিং খবর দিচ্ছি তোমাকে। ঢাকার দরবার শরীফ হুজুর আনোয়ার চিশতী কালই কলকাতায় আসছেন। উঠবেন উজ্জ্বলদাদের হোটেলে। সেটাই জানাল উজ্জ্বলদা।"

প্রীতির সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল, "সত্যি বলছিস তো?"

"সত্যিই বলছি। আজকের 'বর্তমান' পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছে। উজ্জ্বলদা পত্রিকাটা নিয়ে আর ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই আসছে।"

প্রীতির পিছন পিছন দু'হাতে খাবারের বাটি নিয়ে ঢুকছিল লক্ষ্মী সোরেন। সাড়ে-চার ফুট উচ্চতার বছর তেরর, উজ্জ্বল কালো লক্ষ্মী প্রীতির হেলপিং হ্যাণ্ড। তিন বছর হলো এ-বাড়ি এসেছে। এরই মধ্যে প্রীতির যত্নে সুন্দর গাইছে। প্রতিদিনই রেওয়াজ ও পড়াশুনো ছাড়া আর একটা জিনিস চালিয়ে যায়, সিগারেট ও চায়ের ব্যাপারে আনন্দবাবুকে কড়া শাসন। প্রীতির উচ্ছাস দেখে লক্ষ্মী বললো, "কে আসছে গো মামী?"

প্রীতি বার তিনেক এ-পাশ ও-পাশ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "দারুণ একজন।"

প্রীতির খুশিতে উচ্ছসিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হুজুর আনোয়ার চিশতীর নানা অলৌকিক

ক্ষমতার বহু কাহিনী প্রতিনিয়ত পড়ে পড়ে হুজুরকে দেখার ইচ্ছেটা কিছু দিন ধরে এতই তীব্র হয়েছিল যে ওই সুফী সাধককে দর্শন করার ইচ্ছেয় বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনন্দবাবুকে কম পীড়াপীড়ি করেন নি। আনন্দবাবু প্রতিবারই 'দেখছি', 'যাব', 'আর একটু সবুর কর, সময় বের করতে পারছি না', ইত্যাদি বলে যে এড়িয়ে যাচ্ছেন এটা বুঝতে পেরে প্রীতি বলেছিলেন, "থাক থাক, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই 'সুর-সঙ্গম-এর গ্রুপ নিয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলব।"

প্রীতি কিন্তু কথাগুলো বলার পর বিষয়টাকে আর হালকাভাবে নেয়নি। সুর-সঙ্গমের কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের রিয়ারসাল যেমন সিরিয়াসলি সুরু করে দিয়েছিলেন, তেমনি বাংলাদেশে যাওয়ার বিষয়েও যোগাযোগও করছিলেন। আর এমনি সময় মেঘ না চাইতেই জল। হুজুর আনোয়ার চিশতী স্বয়ং আসছেন কলকাতায়। উচ্ছাস তো আসবেই।

এখন দেওয়ালের কোয়ার্টজ ঘড়িতে পাঁচটা পঞ্চাশ। আনন্দবাবুর দশ বাই বারো ছোট বাইরের ঘরটার দেওয়ালের পুরোটাই প্রায় বইয়ে ঠাসা! দেওয়ালে তিনটে ছবি টাঙানো। শিল্পী শক্তি বর্মন, গণেশ হালুই ও লালুপ্রসাদ সাউয়ের আঁকা। দেওয়ালে ঝোলান বিভিন্ন র‍্যাকে বইয়ের মাঝে মাঝে সাজান রয়েছে নানা আকারের, নানা ধরনের, নানা মাধ্যমের মূর্তি। কোনটা টেরাকোটা, কোনটা পাথরের, কোনটা প্লাস্টার অফ প্যারিসের কোনটা পেতলের। ঘরে আসবাব বলতে একটা ডিভান, একটা সোফাকাম বেড, একটা ফোল্ডিং টেবিল, গোটান থাকলে মনে হয় সেগুন কাঠের মোটা ফ্রেমে বাঁধান জাপানে তোলা বড় আকারের রঙিন ছবি। মেঝেতে বিছোন সুতির কার্পেট।

এই মুহূর্তে ডিভান, সোফা ও কার্পেটে ঠাসাঠাসি করে সতেরজন বসে। এঁরা প্রত্যেকেই যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য। আনন্দবাবু সপ্তাহের তিনটে দিন সমিতির বউবাজারের অফিসে, বসেন বিকেল

পাঁচটা থেকে আটটা। আজ আনন্দবাবুর বউবাজারের অফিসে বসার দিন নয়। আগামী কালই বসবেন। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই হুজুর আনোয়ার চিশতীর কলকাতায় আসার খবর কাগজে পড়ে মনে করেছেন, আজই এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করে নেওয়া একান্তই জরুরী।

এখন প্রত্যেকের হাতেই একটা করে কাগজের প্লেট। তাতে পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, আদার কুচি, কড়াইশুঁটি ও আচারের তেল দিয়ে মাখা মুড়ি ও ফুলকপির পেঁয়াজি। কাগজের কাপে চা। কাগজের কাপ ও ডিসের স্টক প্রীতির ভাঁড়ারে সব সময়ই ভাল। বাড়িতে বেশি লোকজন এলে কাগজের কাপ-ডিসই ব্যবহার করেন প্রীতি।

চা ও মুড়ি মাখার সঙ্গে হুজুর চিশতীকে নিয়ে চলেছে গভীর আলোচনা।

আনন্দবাবু একটু আগে ফিরেছেন। পোশাক পাল্টাবার সময় পাননি। পরনে বাটা কোম্পানীর নেভি-ব্লু ব্যাগি শার্ট ও সিলভার কলারের মাখন জিনস্-এর ব্যাগি ট্রাউজার। চোখে চশমা। ওটা পড়ার সময় দরকার হয়। জুতো মোজাটা শুধু ছেড়েই আলোচনায় বসে গেছেন আনন্দবাবু।

কার্পেটে আনন্দবাবুর পাশে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার স্তূপ। আনন্দবাবু এতক্ষণ ওইসব পত্র-পত্রিকা থেকে হুজুর আনোয়ার চিশতী বিষয়ে প্রকাশিত নানা খবর ও ছবি দেখিয়ে প্রকাশিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্তসার বলছিলেন। চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আনন্দবাবু আবার শুরু করলেন, "তাহলে হুজুর সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত আমরা যা জানতে পারলাম, তাকে ছোট্ট করে গুটিয়ে নিলে এই দাঁড়ায়, হুজুর আনোয়ার চিশতীর বয়স সাঁইতিরিশ। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুট। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, পড়াশুনো সামান্য। স্কুলের গণ্ডি পার হননি। শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল প্রচণ্ড দারিদ্রের মধ্যে। এক সময় বাউণ্ডুলে জীবন কাটিয়েছেন। ঘুরেছেন বিভিন্ন অঞ্চলে, নিয়েছেন বিভিন্ন পেশা। ঢাকায় ফিরলেন একাশিতে। নিজেকে সুফি সাধক বলে পরিচয় দিতে থাকেন। রাজনীতির উচ্চমহলে যাতায়াত শুরু

করেন বাংলাদেশের এক মন্ত্রীর হাত ধরে। বর্তমানে সে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ। আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হলিউডের একাধিক চিত্র-তারকারাও তাঁর একান্ত ভক্ত। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশে একটা গুণ পেয়েছেন। অসাধারণ বাক্‌পটু। লোককে বশ করার ক্ষমতা রাখেন রূপে নয়, স্রেফ কথার গুণে। কথাটা হুজুর ভালই বলেন। আন্তর্জাতিক মহলে যাতায়াতের ফলে বাংলা, উর্দু ছাড়া ইংরেজি এবং হিন্দী ভাষাতেও তিনি রীতিমতো দক্ষ। আমাদের দেশের কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কলকাতা বোম্বের কিছু অভিনেতা অভিনেত্রী হুজুরের স্নেহধন্যের তালিকায় আছেন।

"হুজুর সুফী সাধক বলে নিজের পরিচয় দিলেও তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে সর্বত্যাগী চেহারার হদিশ পাওয়া যায় না। ঢাকা শহরের উপকণ্ঠে আট বিঘা জমির ওপর গড়ে তুলেছেন এক বিরাট কমপ্লেক্স। তাঁর বাসভবন বা দরবার শরীফ পাঁচতলা। ইসলামী স্থাপত্য-শিল্পের এক অসাধারণ নিদর্শন। ব্যবস্থাপত্তর পাঁচ তারা হোটেলের মতো। কমপ্লেক্সে রয়েছে মসজিদ ও মাদ্রাসা। মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা চার হাজারের ওপর। প্রতিদিন প্রথম আসার ভিত্তিতে পাঁচ হাজার নারী-পুরুষকে দর্শন দেন। দর্শন প্রার্থীদের টিকিট কাটতে হয় পঁচিশ টাকার বিনিময়ে। ভিড় সামাল দিতে রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আড়াইশো সদস্য। যাঁরা রোগ মুক্তি বা সমস্যা মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে আসেন তাঁদের ছাপান 'দোয়া' (প্রার্থনা) দেওয়া হয়। 'দোয়া' উর্দু ভাষায় লেখা, ছয় সেন্টিমিটার বাই চার সেন্টিমিটার আর্ট পেপারে সবুজ কালিতে ছাপা। 'দোয়া' বিতরণ করেন স্বেচ্ছা-সেবকরাই। হুজুর কিছুক্ষণ পরপর মাইকে 'দোয়া' পাঠ করে দেন। তাতেই কাগজের ছাপান দোয়ায় অলৌকিতার ছোঁয়া লাগে। এই দোয়ার কাগজ জলে ডুবিয়ে এক মাস জল পান করতে বলেন। হাঁপানি, বাত, প্যারালাইসিস রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপত্র একটু ভিন্ন। তাঁদের দুটি দোয়া দেওয়া হয়! সবুজ কালিতে লেখা দোয়াটি জলে ডুবিয়ে পান করার জন্য। এবং দ্বিতীয় দোয়া লাল কালিতে একই

আকারের কাগজে ছাপা। এটা তেলে ডুবিয়ে সেই তেল মালিশ করতে হয় রোগীর শরীরে। দোয়ার মূল্য আলাদা। হুজুরের কথায়, "আমার আদর্শ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করা, মানুষের হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আমার দোয়ায় আল্লাহর রহমত (কৃপা) যাঁরা পান তাঁরা ভালো হয়ে যান। আল্লাহর রহমত পেতে গেলে, তাঁর ওপর গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে, গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে আমার দোয়ার ওপর।" অনেকেই যে রোগমুক্ত হয়েছেন হুজুরের দোয়ার দৌলতে, তার প্রমাণ হিসেবে আজ পর্যন্ত কয়েক হাজার রোগ-মুক্ত মানুষের ছবি বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

"হুজুরের যে অলৌকিক ক্ষমতা সাধারণ মানুষকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছে তা হলো মন্ত্র শক্তিতে কাঁচা ডিমকে সেদ্ধ করা। যে রমণী দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে মা হতে পারেননি অথচ হতে চান, তাঁকে একটি কাঁচা ডিম আনতে বলেন। ওই রমণীর হাতে ধরে রাখা ডিম দোয়া পড়ে দেন হুজুর। তারপর ডিমটা ফাটালেই দেখা যায় ওটা সেদ্ধ হয়ে গেছে।

"এতক্ষণ যা বললাম, এর ওপর কোনও প্রশ্ন আছে?"

"পত্র-পত্রিকায় যে সব রোগী-রোগিণীদের রোগ মুক্তির গল্প ফাঁদা হয়েছে, তার সবই তো গুল-গল্প হতে পারে। যাদের কথা লেখা হয়েছে, ঠিকানা খোঁজ করলে তাদের হদিশ হয় তো মিলবে, কিন্তু ওরা যে সত্যিই অসুস্থ ছিলেন তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ কিন্তু আমরা পাইনি। তারা তো টাকা-পয়সা খেয়ে মিথ্যেও বলতে পারে?"

কথাগুলো বললেন অশোক। বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে, গায়ের রঙ ফরসা, এক মাথা চুল, পুরুষ্টু গোঁফ। সাধারণ বাঙালীদের তুলনায় উচ্চতা কিছুটা কম। ট্রাউজারের ওপর না-গোঁজা শার্ট আর কাঁধে একটা স্তুতির ব্যাগ। পরিশ্রমী, তৎপর ও দুঃসাহসী হিসেবে দলের সবার প্রিয়।

"তোমার যুক্তিটা খুবই ভালো। এমন সাজান রোগী বহু ক্ষেত্রেই হাজির করা হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাজান রোগী নাও

থাকতে পারে।" আনন্দবাবু কথা শেষ করে একটা উইলস ধরালেন।

শশাংক মণ্ডল আনন্দবাবুর কথাগুলো মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, "তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে তাঁর 'দোয়া' কাজ করছে?"

শশাংক দমদম পার্ক স্কুলের শিক্ষক। এম. এস. সি., বি. এড. স্পষ্ট-বক্তা। আঠাস বছরের সুদর্শন তরুণ। লড়াকু।

"ঠিক তাই। এই কথাটাই বলতে চাইছি। দোয়াতেও অনেকে রোগ মুক্ত হতে পারেন। অনেক সময় আমরা শুনে থাকি অমুকবাবা, অমুক অবতার, অমুক পীরের তাবিজ, কবচ ধারণ করে অথবা জলপড়া পান করে, তেল পড়া লাগিয়ে অমুকে রোগ মুক্ত হয়েছেন। এর সবগুলোই যে অবতার, পীর বা বাবাজী মাতাজীদের এজেন্টদের মিথ্যে প্রচার, তা কিন্তু নয়। বাস্তবিকই অনেক সময় ওসবে রোগ কমে, রোগ সারে। যেসব ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই ওইসব জলপড়া, তেলপড়ায় রোগ কমে বা সারে, সেই সব ক্ষেত্রেও রোগ সারার কারণ অলৌকিত্ব নয়। কারণ হলো ওই সব তাবিজ, কবচ, জলপড়া, তেলপড়া যে দিচ্ছে, তার ওপর রোগীর গভীর বিশ্বাস।"

উজ্জ্বল হাত তুলে বললেন, "এক মিনিট ডিসটার্ব করছি। আপনার এই বক্তব্যের পিছনে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। আমরা মনে করি সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করব, শুধুমাত্র তারপরই গ্রহণ করব বা বর্জন করব। অতএব আপনি যদি আপনার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি হাজির করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে আপনার যুক্তি বিচার করে গ্রহণ করা সহজতর হবে।"

উজ্জ্বলের কথা অনেকেরই যে মনে ধরেছে, তা ওর বক্তব্যকে অনেকেই সমর্থন করায় বুঝতে অসুবিধে হলো না। পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি উচ্চতার চট্পটে ডাকাবুকো উজ্জ্বলের বয়স সাতাশ হলেও মুখটায় এমন একটা ভাব আছে যে দেখলে মনে হয় কলেজের ছাত্র। পরনে সব সময় থাকে জিনসের ট্রাউজার আর কলারওয়ালা হাফহাতা গেঞ্জি, আজও তাই আছে। গত বছর অ্যাসোশিয়েশনের পক্ষে কুসংস্কার

মুক্তির বার্তা নিয়ে সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করে এসেছে।

আনন্দবাবু বললেন, "এই অবসরে একটা ঘটনা বলি। '৮৭র মে মাসের এক সন্ধ্যায় একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের স্ত্রী এসেছিলেন আমার কাছে। সঙ্গে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক।

"চিকিৎসক জানালেন বছর আড়াই আগে সম্পাদকের স্ত্রীর ডান উরুতে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। ছোট্ট অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন ও ওষুধে ফোঁড়ার ক্ষত সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। কিন্তু এরপর ওই শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থান নিয়ে শুরু হয় এক নতুন সমস্যা। মাঝে-মাঝেই উরুর শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত ও তার আশ-পাশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কখনও ব্যথার তীব্রতায় রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এই বিষয়ে যেসব চিকিৎসকদের দেখান হয়েছে ও পরামর্শ নেওয়া হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার শীর্ষস্থানীয়। ব্যথার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ তাঁরা খুঁজে পাননি। চিকিৎসকদের ব্যবস্থা-পত্র, এক্স-রে ছবি ও রিপোর্ট সবই দেখালেন আমাকে।

"আমি পেশায় মানসিক চিকিৎসক না হলেও মাঝে-মধ্যে এই ধরনের কিছু সমস্যা নিয়ে কেউ কেউ আমার কাছে হাজির হন। রোগিণীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে উরুর শুকনো ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললাম, "একবার খড়গপুরে থাকতে দেখেছিলাম একটি লোকের হাতের বিষ-ফোঁড়া সেপটিক হয়ে, পরবর্তী-কালে গ্যাংগ্রিন হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস করুন, সামান্য ফোঁড়া থেকে এই ধরনের ঘটনাও ঘটে।"

"রোগিণী বললেন, 'আমি নিজেই এই ধরনের একটা ঘটনার সাক্ষী। মেয়েটির হাতে বিষ-ফোঁড়াজাতীয় কিছু একটা হয়েছিল। ফোঁড়াটা শুকিয়ে যাওয়ার পরও শুকনো ক্ষতের আশে-পাশে ব্যথা হতো। একসময় জানা গেল, ব্যথার কারণ গ্যাংগ্রিন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কাঁধ থেকে হাত বাদ দিতে হয়।"

"যা জানতে গ্যাংগ্রিনের গল্পের অবতারণা করেছিলাম তা আমার জানা হয়ে গেছে। এটা এখন আমার কাছে দিনের মতই স্পষ্ট যে,

সম্পাদকের স্ত্রীর ফোঁড়া হওয়ার পর থেকেই গ্যাংগ্রিন স্মৃতি তাঁর মনে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই ফোঁড়া থেকেই আবার গ্যাংগ্রিন হবে না তো ? এই প্রতিনিয়ত আতঙ্ক থেকেই এক সময় ভাবতে শুরু করেন, ফোঁড়া তো শুকিয়ে গেল, কিন্তু মাঝে-মধ্যেই যেন শুকনো ক্ষতের আশে-পাশে ব্যথা অনুভব করছি ? আমারও আবার গ্যাংগ্রিন হলো না তো ? সেই লোকটার মতোই একটা অসহ্য কষ্টময় জীবন বহন করতে হবে না তো ?"

"এমনি করেই যত দুশ্চিন্তা বেড়েছে, ততই ব্যথাও বেড়েছে। বিশ্বাস থেকে যে ব্যথার শুরু, তাকে শেষ করতে হবে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই।

"আমি আর একবার উরুর শুকনো ক্ষত গভীরভাবে পরীক্ষা করে এবং শরীরের আর কোথায় কোথায় কেমনভাবে ব্যথাটা ছড়াচ্ছে, ব্যথার অনুভূতিটা কি ধরনের ইত্যাদি প্রশ্ন রেখে গম্ভীর মুখে একটা নিপাট মিথ্যে কথা বললাম, 'একটা কঠিন সত্যকে না জানিয়ে পারছি না, আপনারও সম্ভবত গ্যাংগ্রিনের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে একটু একটু করে।'

"আমার কথা শুনে রোগিণী মোটেই দুঃখিত হলেন না। বরং উজ্জ্বল মুখে বললেন, 'আপনিই সম্ভবত আমার অসুখের সঠিক কারণ ধরতে পেরেছেন।'

"আমি আশ্বাস দিলাম, 'আমি অবশ্য নিশ্চিত নই, তবে আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, আমার অনুমান ঠিক কি না। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে আপনার কর্তাটিকে একটু কষ্ট করতে হবে। বিদেশ থেকে ওষুধ-পত্তর আনাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখবেন, তারপর সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।'

"রোগ সৃষ্টি ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের শরীরে বহু রোগের উৎপত্তি হয় ভয়, ভাবনা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে। আমাদের মানসিক ভারসাম্য নির্ভর করে

সামাজিক পরিবেশের ওপর। সমাজ জীবনে অনিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধর্মোন্মাদনা, জাত-পাতের লড়াই ইত্যাদি যত বাড়ছে মানসিক কারণে দেহের অসুখও ততই বাড়ছে।

"মানসিক কারণে যে-সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, মাথার ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, স্পণ্ডালাইটিস, স্পণ্ডালোসিস, আরথ্রাইটিস, বুক ধড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, গ্যাসট্রিকের অসুখ, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, ব্রঙ্কাইল অ্যাজমা, ক্লান্তি, অবসাদ ইত্যাদি। ঔষধি মূল্যহীন ক্যাপসুল, ইনজেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' চিকিৎসা পদ্ধতি।

"রোগিণীর পারিবারিক চিকিৎসকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে জানালাম, ব্যথার কারণ সম্পূর্ণ মানসিক। রোগিণীর মনে সন্দেহের পথ ধরে একসময় বিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে তাঁর উরুর ফোঁড়া সারেনি, বরং আপাত শুকনো ফোঁড়ার মধ্যে রয়েছে গ্যাংগ্রিনের বিষ। রোগিণীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে কেমনভাবে 'প্ল্যাসিবো' চিকিৎসা চালাতে হবে সে বিষয়ে একটা পরিকল্পনার কথা খুলে বললাম।

"এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রোগিণীর পারিবারিক ডাক্তার সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া উরুর ফোঁড়ার ওপর নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে একটা মেশিনের সাহায্যে রেখা-চিত্র তৈরি করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে আবার রেখা-চিত্র তুললেন। দু-বারের রেখা-চিত্রেই রেখার প্রচণ্ড রকমের ওঠা-নামা লক্ষ্য করে স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, গ্যাংগ্রিনের বিষের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। নিউইয়র্কে খবর পাঠিয়ে দ্রুত আনান হলো এমনই চোরা গ্যাংগ্রিনের বিষের অব্যর্থ ইন্‌জেকশন। সপ্তাহে দু'টি করে ইন্‌জেকশন ও দু'বার করে রেখা-চিত্র গ্রহণ চলল তিন সপ্তাহ। প্রতিবারই রেখা-চিত্রে দেখা যেতে লাগল রেখার ওঠা-নামা আগেরবারের চেয়ে কম। ওষুধের দারুণ গুণে ডাক্তার

যেমন অবাক হচ্ছিলেন, তেমন রোগিণীও। প্রতিবার ইন্‌জেকশনেই ব্যথা লক্ষণীয়ভাবে কমছে। তিন সপ্তাহ পরে দেখা গেল রেখা আর আঁকা-বাঁকা নেই, সরল। রোগিণীও এই প্রথম অনুভব করলেন, বাস্তবিকই একটুও ব্যথা নেই। অথচ মজাটা হলো এই যে, বিদেশী দামী ইন্‌জেক্‌শনের নামে তিন সপ্তাহ ধরে রোগিণীকে দেওয়া হয়েছিল স্রেফ ডিসটিলড ওয়াটার।

"আর একটা ঘটনা বলি। এই ঘটনাটা আমার শোনা। বলেছিলেন, প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সাহিত্যিক ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। ডাঃ রায় তখন ছাত্র। সার্জারির অধ্যাপক ছিলেন ডাঃ অমিয় মুখার্জি। ডাঃ মুখার্জির কাছে এলেন এক রোগিণী। মহিলাটির সমস্যা হলো, তাঁর ধারণা গলস্টোন হয়েছে তাঁর: এই ধারণা নিয়ে এর আগে কয়েকজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন পেটে ব্যথার কারণ গলস্টোন নয়, অন্য কিছু। দু'জন ডাক্তার তো ব্যথার কারণ মানসিক বলে মত প্রকাশ করে মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নিতে বলেছেন। চিকিৎসকদের এই ধরনের মতামতকে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অপদার্থতার নিদর্শন হিসেবে ধরে নিয়ে রোগিণী ডাঃ মুখার্জির কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, 'বলুন তো, আমি কি পাগল, যে সাইকিয়াট্রিসটের কাছে যাব?'

"ডাঃ মুখার্জি পরম ধৈর্যের সঙ্গে মহিলার সব কথা শুনলেন, পরীক্ষা করলেন। গল-ব্লাডারের এক্স-রে করালেন। দেখা গেল স্টোন নেই। ডাঃ মুখার্জি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়ে দিলেন রোগিণীকে বলতে, তাঁর গলস্টোন হয়েছে। অপারেশন করে স্টোনগুলো বার করে দিলেই ব্যথার স্থায়ী উপশম হবে।

"রোগিণীকে জানান হলো, অমুক দিন অপারেশন করা হবে। নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান করে পেটের চর্বিস্তর পর্যন্ত কাটলেন ডাঃ মুখার্জি। তারপর সেলাই করে দিলেন। ও. টি. স্টাফদের কয়েকটা রঙিন ছোট ছোট পাথর দিয়ে ডাঃ মুখার্জি বললেন, 'রোগিণীর জ্ঞান ফেরার পর তাঁকে এই পাথরগুলো দেখিয়ে

বলবেন, এগুলো তাঁর পিত্তথলিতে পাওয়া গেছে।'

"রোগিণী কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলেন। সেলাই কেটেছিলেন ডাঃ মুখার্জি। রোগিণী হৃষ্টচিত্তে রঙিন পাথগুলো নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। যে ক-দিন হাসপাতালে ছিলেন, সে ক-দিন গলব্লাডারে কোনও ব্যথা অনুভব করেননি! অথচ আশ্চর্য, সাজান অপারেশনের আগে প্রতিদিনই রোগিণী গলব্লাডারে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতেন।

"এমনি আরো বহু উদাহণ তুলে দিতে পারি। কিন্তু এই দুটো উদাহরণ থেকেই বোধহয় সকলে আমার বক্তব্যের সারবত্তা অনুধাবন করতে পেরেছেন। সুতরাং হুজুরের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে কেউ তাঁর 'দোয়া' ভিজিয়ে জল খেলে বা তেল মালিশ করলে রোগমুক্ত হতেই পারে, যদি তার অসুখ মানসিক কারণে হয়ে থাকে। এই বিষয়ে আর কিছু প্রশ্ন?"

পিংকি এতক্ষণ অ্যাসোসিয়েশনের আগুনবাবা রঘুদার পাশে বসেছিল। রঘু পেশায় শাড়ির ডিজাইনার। শান্তশিষ্ট যুবক। ফর্সা রঙ, সাঁইবাবার মত একমাথা চুল। ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট। পিংকি বাবার কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই রঘুদার চুলের জঙ্গলে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছিল। আর রঘু ততবারই পিংকির হাতটা সরিয়ে দেওয়ার কাজটা সমাধা করেছিলেন সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে।

পিংকিকে অপ্রস্তুত করার মতলবে রঘু বললেন, "পিংকির একটা প্রশ্ন আছে।"

পিংকির মাথায় একটা প্রশ্ন আনাগোনা করছিল কিছুক্ষণ ধরে। প্রশ্নটা এক সময় করতই। কিন্তু রঘুদার দুষ্টুমি পিংকিকে এখনই সেই প্রশ্ন হাজির করতে বাধ্য করল।

"আমরা যেহেতু যুক্তিবাদী তাই প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছুকে গ্রহণ করিনা। এটা যেমন একদিক থেকে সত্যি, তেমনই সত্যি, হুজুর যদি কোনও কৌশল গ্রহণ না করে স্রেফ দোয়ায় ডিম সেদ্ধ করে দেন, তাহলে হুজুরের অলৌকিক ক্ষমতাকেও আমরা মেনে নেব। হুজুরের মুখোমুখি হওয়ার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত কী কী

কৌশলের সাহায্যে কাঁচা ডিমকে সেদ্ধ করা যেতে পারে। যাতে হুজুর কৌশল গ্রহণ করলে ধরতে পারি। কী কী কৌশলে ডিম সেদ্ধ করা যেতে পারে এই বিষয়ে যদি কেউ আলোকপাত করেন, তাহলে ভাল হয় বলে মনে করি।"

জ্যোতি মুখার্জি মুখ খুললেন, "অনেক রকম ভাবেই এমনটা ঘটান সম্ভব, হুজুর ঠিক কী ভাবে ডিম সেদ্ধ করছেন, সেটা না দেখে আলোচনা করা অর্থহীন ও শুধুমাত্র সময়ের অপচয় বলেই মনে করি।"

জ্যোতি মুখার্জির বয়স পঞ্চান্নর ধারে-কাছে। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। রঙ ফর্সা, অতি শীর্ণ এবং অতি প্রাণচ্ছল মানুষ। কাজ করেন একটি সিনেমা কোম্পানীতে, অপেশাদার জাদুকরও।

জ্যোতি মুখার্জির কথাকে সমর্থন জানালেন দুই পেশাদার জাদুকর চণ্ডীচরণ সরকার ও সুধীরকুমার।

হুজুরের কৌশলটা একবার চাক্ষুস দেখার দায়িত্ব দেওয়া হলো ওই দুই পেশাদার জাদুকরকে। হুজুরের কৃপাপ্রার্থীদের ভিড়ে মিশে থাকার দায়িত্ব দেওয়া হলো সমীর, অশোক, কমল, তমাল ও দেবুকে। কার কী দায়িত্ব, বুঝিয়ে দিলেন আনন্দবাবু।

সকাল সাতটা থেকে সাতটা পাঁচের মধ্যেই আলাদা আলাদা ভাবে সকলেই পৌঁছে গিয়েছিলেন হোটেল বেঙ্গলে। রাস্তায় তখন বিশাল লাইন। লাইনে দাঁড়াতেই স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে এসে রবার স্ট্যাম্প মারা এবং নম্বর লেখা একটুকরো করে কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

চণ্ডীচরণ সরকারের ওরফে সি.সি. সরকারের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। নাম করা জাদুকর। উচ্চতা গড় বাঙালীর মত। গায়ের রঙ ময়লা হলেও সতেজ চক্চকে চামড়া। একটু ভুঁড়ি হলেও যথেষ্ট স্মার্ট। চোখে-মুখে সব সময় একটা হাসি মাখিয়ে রাখেন। যদিও কেউ কেউ ওই হাসির মধ্যে পেশাদারী মানসিকতা বা কৃত্রিমতার গন্ধ পান। আজ সঙ্গে এনেছেন স্ত্রী জয়ন্তীকে। ফর্সা, স্থূলাঙ্গী, আদুরে চেহারার মহিলা। দুই সন্তানের জননী হলেও আজ নিঃসন্তান রমণীর ভূমিকায়

নেমেছেন। চণ্ডী আজ পরিচিত কারো মুখোমুখি হতে খুব একটা ইচ্ছুক নন। তাই মাথায় চাপিয়েছেন একটা পশমের টুপি, চোখে গাঢ় রঙের সানগ্লাস। লাইনে বার তিনেক চক্কর মেরেছেন। গুণতিতে সঠিক দর্শনার্থীর সংখ্যা নির্ণয় অসম্ভব। অনেকেই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে রয়েছেন, গল্প করছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, শীতের রোদ উপভোগ করছেন, কারণ হুজুরের ডাক পড়া শুরু হবে দশটায়। তবু চণ্ডীর মনে হলো, দর্শনার্থীর সংখ্যা এখনই ছ'শো পেরিয়ে গেছে। সমীর, অশোক, তমাল, কমল, দেবু প্রত্যেককেই দেখছেন। ওঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে, বসে এর-ওর সঙ্গে গল্প-সল্প করছেন। সুধীর-কুমার খবরের কাগজ পেতে বসেছেন, সঙ্গী একটি বউ।

সুধীরকুমার অবিবাহিত। বয়স পঁয়তাল্লিশের ধারে-কাছে। মাথায় সামান্য টাক পড়েছে। স্টেজে পাগড়ি থাকে মাথায়। পাগড়ি পরিহিত ঝকঝকে তরুণ সুধীরকুমার ও বিরল কেশ প্রৌঢ় সুধীরকুমারের এতই পার্থক্য যে দু-জনকে একই মানুষ বলে মেনে নেওয়া মুশকিল।

সুধীরকুমারের স্ত্রীর ভূমিকায় আজ অভিনয় করছেন নীনা পারেখ, সুধীরকুমারের স্টেজের সহকারী। পাঁচ তিন উচ্চতার চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের নীনা এক সন্তানের মা। ছেলে শিবাজী এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। নীনার জন্ম কলকাতায়। স্বামী অঞ্জন দু'পুরুষ ধরে কলকাতায় বাস করছেন। বউবাজারে ম্যাজিক সরঞ্জাম বিক্রির দোকান আছে।

সমীর মাঝে মাঝেই ওর সামনে-পিছনে দাঁড়ান লোকদের বলে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সমীর অনেকদিনের পোড়খাওয়া রাজনীতি করা মানুষ। বছর দুয়েক হলো সক্রিয় রাজনীতি থেকে বসে গিয়ে যুক্তিবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। বয়স তেত্রিশ। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা, মেদহীন চেহারা। গায়ের রঙ ফর্সা, চোখের মণি কটা, চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। ঠোঁটে প্রায় সব সময়ই দুটি জিনিস ঝুলিয়ে রাখেন, সিগারেট আর হাসি।

সমীরের ধারণায় লাইনে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা জনাকুড়ি। এদের বেশির ভাগই স্থানীয় মস্তান, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। লাইনে নিশ্চয়ই কিছু সাজান দর্শনার্থী দাঁড় করান আছে, অনুমান করল সমীর।

লাইনে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করে সিগারেটের টুকরোটা ক্যারামের ঘুঁটি মারার কায়দায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঢুকলেন হোটেলের লাউঞ্জে। প্রচুর ভিড়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এঁদের বেশির ভাগই হুজুরের কৃপাপ্রার্থী। এঁদের সামলাচ্ছেন জনা আটেক তরুণ থেকে মধ্যবয়স্ক পুরুষ। এঁদের প্রত্যেকেরই পোশাক-আশাক খুব দামী।

কাউন্টারের দিকে তাকালেন সমীর। উজ্জ্বল ও তার দু-পাশে একটি তরুণ ও একটি তরুণী হাসি মুখে খদ্দের সামলাচ্ছেন। সমীর হাজির হলেন উজ্জ্বলের সামনে, "এক্সকিউজ মি। বর্তমান পত্রিকার জার্নালিস্ট রাজীব বসু কোনও খবর দিয়েছেন ফোনে সমীরকে দেওয়ার জন্যে?"

"না স্যার।" উজ্জ্বল মাপা হাসির সঙ্গে বললেন।

সমীর আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হলো না বাঁ কাঁধে একটা বিশাল থাপ্পড় এসে পড়ায়। মুখ ঘোরাতেই দেখলেন সাফারি স্যুট পরিহিত, ডান হাতের কব্জিতে মোটা সোনার চেন ঝোলান এক বছর পঁয়ত্রিশের তরুণ তাঁরই কাঁধে হাত রেখে হাসছেন। হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে না দিয়ে সমীর ভাবতে চেষ্টা করলেন, এ কে হতে পারে? ছিপ্‌ছিপে লম্বা, ফর্সা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কোথায় যেন দেখেছি? কোথায়? কলেজে।

"আরে তুমি, এখানে?" সমীর বলল।

"আমি কে বল তো?"

সমীর হাসল। "নামটা এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না। তবে তোমাকে ভুলি কী করে? প্রায়ই একটা নীল ফিয়াট চালিয়ে কলেজে আসতে। ক্লাসের চেয়ে টেবিল টেনিসের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। ইউনিভার্সিটি রিপ্রেসেন্ট করেছিলে। পার্ক স্ট্রিটে তোমাদের একটা ট্রাভেলিং কোম্পানী ছিল।"

"যাক, মনে রেখেছ তাহলে, আমি সামসুল ইসলাম। আমাদের কোম্পানীর নাম 'কাফেলা ট্রাভেলস্'। তুমি আমার নাম ভুলে গেলেও তোমার নাম কিন্তু আমার মনে আছে, সমীর। অবশ্য কলেজ ইউনিয়ানের জি. এস-এর নাম ভোলার কথা নয়। তারপর, তুমি এখানে কি মনে করে?"

"হুজুর আনোয়ার চিশতী'র সঙ্গে দেখা করব বলে আসা।"

—'হো-হো' করে হেসে উঠলেন সামসুল, "সে কি, তোমার মত এককালের বাঘা নাস্তিক ছাত্রনেতা শেষ পর্যন্ত সুফী, পীরদের দোয়ায়, আল্লার রহমতে রোগ সারে বলে বিশ্বাস করতে শুরু করল? এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা!"

সমীরও ঝুলিয়ে রাখা ঠোঁটের হাসিকে বজায় রেখে বললেন, "রক্ত গরম থাকলে অনেক কিছুকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী, বিপ্লবী ইমেজ বজায় রাখে মানুষ। তারপর বয়স বারে, বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে থাকে। তখন অনেক অস্বীকার করা বিষয়কেই স্বীকার করে নিতে থাকে! এটাই তো মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। তা তুমি এখানে কেন? তুমিও কি হুজুরের কৃপাপ্রার্থী?"

"কৃপাপ্রার্থী তো বটেই। তবে তোমার মত কোনও সমস্যা নিয়ে আসিনি। হুজুরকে এদেশে আনার দায়িত্ব নিয়েছে কাফেলা ট্রাভেলস্। হুজুরের সঙ্গে এসেছেন আরো চোদ্দজন। তাঁদের থাকা, খাওয়া, বিজ্ঞাপন দেওয়া, ভিড় আর ঝামেলা সামলাবার জন্য ভলেনটিয়ার যোগাড় করা, সব দায়িত্বই আমাদের ওপর। হুজুর না ফেরা পর্যন্ত এই হোটেলেই আমি ঘাঁটি গেড়েছি! চল ওপরে চল।"

লিফ্‌টেই দোতলায় উঠলেন সমীর ও সামসুল। একটা রুমের সামনে জনাপনের নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে। দরজা আগলে রেখেছেন দুই স্বাস্থ্যবান মধ্যবয়স্ক।

সামসুল বললেন,"এ-ঘরেই হুজুর আছেন। একজন বড়জোর দু-জন করে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। এই ফ্লোরের দশটা রুম বুক করেছি।"

রুম নম্বর ১৬র সামনে এসে দাঁড়ালেন সামসুল। দরজায় তিনবার

টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। সামসুল সমীরকে বললেন, "এসো।"

ঘরে ছিলেন দু'জন। একজন দরজা খুললেন, অন্যজন বিছানায় বসে আঙুর খাচ্ছিলেন। সামসুল সমীরের পচিয়র দিয়ে বললেন, "ইনি সমীর ভাই। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। আমাদের জি,এস ছিল। দারুণ ছেলে।"

যিনি দরজা খুলেছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে সামসুল বললেন, "ইনি আমাদের আলীভাই, আলী কবীর। বাংলাদেশের কোটিপতি ব্যবসায়ী। ওখানে অনেক ব্যবসা আছে। প্রধান ব্যবসা—একটা দৈনিক ও তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক।

নমস্কার বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে আলী কবীরকে একবার জরিফ করে নিলেন সমীর, উচ্চতা পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চির মধ্যে। মুষ্টিযোদ্ধার মত স্বাস্থ্য। দামী স্পোর্টস্ গেঞ্জি ও দামী ট্রাউজার পরনে। পায়ে স্যাণ্ডেল, দাঁড়ি, গোঁফ নিখুঁত কামানো। বয়স পয়তাল্লিশের উর্ধে বলেই মনে হলো, চুলে কলপ দেন। ডান হাতের অনামিকায় একটা বিশাল হিরের আংটি।

খাটে বসে যিনি আঙুর খাচ্ছিলেন তাঁর পরিচয়ও পাওয়া গেল। আনোয়ার চৌধুরী। বাংলাদেশের ইমপোর্ট, এক্সপোর্টের বিশাল কারবারী।

আনোয়ার চৌধুরী হাতজোর নমস্কার জানিয়ে বললেন, "বসেন সমীরভাই।"

সমীর সোফায় বসলেন, আনোয়ারের পরণে হালকা নীল রঙের সিল্কের পাঞ্জাবী ও পাজামা। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা, ডান হাতের আঙুলে তিনটে আংটি। বয়স বছর চল্লিশ হবে, বেশ লম্বা। দাঁড়ালে, পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চির নীচে হবে না। এঁরও দাঁড়ি গোঁফ নিখুঁত কামানো।

সোফার সামনে একটা নীচু টেবিল। টেবিলে দুটি বড় প্লেট। একটায় আঙুর, আর একটায় সল্টেড কাজু।

সামসুল বেল বাজিয়ে চার কাপ কফির অর্ডার দিলেন। সামসুলকে

সমীর জানালেন এখানে আসার কারণ। হাঁপানীতে ভুগছেন বেশ কিছু বছর হলো। দিন দিন অবস্থা শুধুই খারাপ হচ্ছে। পকেট থেকে একগাদা ওষুধ-পত্তর বের করে দেখালেন ওদের। বললেন, "সব সময় এই সব হাবিজাবি জিনিস বয়ে বেড়াতে হয়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে।"

সামসুল ভরসা দিলেন, "সে ঠিক আছে, একটু বসো। গল্প-সল্প করো, খাও-দাও, তোমাকে সময় মত হুজুরের কাছে হাজির করার দায়িত্ব আমার।"

খাওয়া ও গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ফোন বাজছিল, সামসুলই ফোন ধরছিলেন। কথোপকথনের মাঝে সামসুল যে অনেক সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করছেন, সমীরের সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি। মাঝে মাঝেই দরজায় তিনটে করে টোকা পড়ছিল। ব্রুসলীর তৎপরতায় সামসুল দরজা খুলে দিচ্ছিলেন, কথা বলছিলেন, বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কিছু সময়ের জন্য।

এই সুযোগে আলীভাই আর আনোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা জমাবার চেষ্টা করলেন। আর এক প্রস্থ কফি এলো, কফির কাপ সামনে নিয়ে যখন আড্ডা জমে উঠেছে তখন দরজায় তিনটি টোকা দিয়ে যাঁরা ঘরে ঢুকলেন তাঁদেরই একজনের কথা শুনে চম্‌কে উঠে তাকালেন বক্তার দিকে। যাকে দেখলেন, তাঁকে দেখার জন্য বিন্দু-মাত্র প্রস্তুত ছিলেন না মানসিকভাবে। আর তাতেই মুখের কফি গিলতে গিয়ে বিষম খাবার যোগাড়। মাঝ-বয়সী একটি চট্‌পটে ভদ্র-লোকের সঙ্গে ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আনন্দবাবু ও কুমার রায়। আনন্দ বাবুর পরনে স্টোন-ওয়াস জিনসের ট্রাউজার ও আকাশী রঙের সুতীর ব্যাগী সার্ট। পায়ে নর্থস্টার। মাথায় লাল রঙের এম, আর, এফ স্পোর্টস টুপি। চোখে সানগ্লাস। ডান হাতের তিন আঙুলে তিনটে গ্রহরত্নের আংটি। গলায় সোনার চেনে কোনও এক বাবার মিনে করা ছবি দোল খাচ্ছে। গোঁফের দু-প্রান্ত মোম দিয়ে ছুঁচলে করে পাকান।

সমীর আনন্দদাকে মনে মনে তারিফ জানালেন, টুপি, আংটি, সোনার চেন আর গোঁফের মোচড়ে চেহারাটা অনেকটাই পাল্টে ফেলেছেন।

কুমার রায় পেশায় চিত্র সাংবাদিক। ছোট-খাট, কিন্তু চটপটে চেহারা। বয়স তিরিশের মধ্যে, শ্যামলা রঙ, একগাল দাঁড়ি-গোঁফ। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ।

সঙ্গের ভদ্রলোক সামসুলের সঙ্গে কথা বললেন, "এঁরা দু'জন এসেছেন 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে হুজুরের একটা সাক্ষাৎকার নিতে। ইনি সাংবাদিক দিলীপ নন্দী, ইনি কুমার রায়, চিত্র-সাংবাদিক।"

নমস্কার বিনিময় করলেন কুমার রায় ও দিলীপ নামের আড়ালে আনন্দবাবু।

আলী কবীর দিলীপ নন্দীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেন। 'ফাইভ ফাইভ ফাইভ' প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলেন আনন্দ বাবুর দিকে। লাইটার দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "দিলীপভাই বসেন। আপনাকে চেনা চেনা মনে হয়! ঢাকায় এক-আধবার গেছিলেন নাকি?"

"না, এখনও যাওয়া হয়নি।"

"এখানে আপনি হুজুরকে আর কতটুকু জানতে পারবেন? ঢাকায় আসেন, ছাখেন। আপনি শুধু আসেন, তারপর সব দায়-দায়িত্ব আমাদের।"

আলী একগাদা খবরের কাগজ ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন একটা ব্রিফকেস থেকে। সেগুলো খুলে খুলে দেখাতে শুরু করলেন হুজুরকে নিয়ে বাংলাদেশে কি বিপুর মাতামাতি চলে।

"আনন্দদা হঠাৎ পরিকল্পনার বাইরে এভাবে হাজির হলেন কেন?" এই প্রশ্নটা যখন সমীরের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তখনই সামসুল সমীরের পিঠে আলতো চাপড় দিয়ে বললেন, "সমীর চলো, আমরা পাশের রুমে বসি। হুজুরের প্রেস সেক্রেটারী আলীভাই কথা বলবেন দিলীপ

বাবুর সঙ্গে। মাঝখান থেকে তুমি বোর হবে।"

পাশের রুমের চাবি ঘুরিয়ে ঢুকলেন সামসুল, পেছনে সমীর। সামসুল ফোনটা তুলে নিয়ে হোটেলের অপারেটরকে জানিয়ে দিলেন, "সামসুল ইসলাম বলছি। আমার কোনও ফোন থাকলে ১৭ নম্বরে দিয়ে দেবেন।"

১৭ নম্বর রুমেও শুরু হয়ে গেল তৎপর মানুষের আনাগোনা ও ফোনের ঝন্‌ঝনা। যাঁরা দরজায় টোকা দিচ্ছেন, তাঁদের অনেককেই ঘরে না ঢুকিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই খুব নীচু স্বরে কথা সেরে নিচ্ছেন সামসুল।

"সমস্যার শেষ নেই, ইতিমধ্যে দু'জন মন্ত্রী এসে দেখা করে গেছেন। ওঁদের নাম জানতে চেও না, বলতে পারব না, অসুবিধে আছে। ডাঃ করালীমোহন মুখার্জির মত ইণ্ডিয়া ফেমাস ডাক্তারও এসে দোয়া নিয়ে গেছেন।" সামসুল কথাগুলো বলে 'বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস'-এর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন। লাইটারের আগুন নেভাবার আগেই ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌। দরজা খুলেই কারো সঙ্গে কথা শুরু করলেন, কথার সুরে হঠাৎ চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করে তাকালেন দরজার দিকে। আগন্তুক আড়ালে, কিন্তু গলার স্বরটা চাপা এবং উত্তেজিত হলেও বড় বেশি চেনা-চেনা ঠেকল। একটু ঝুঁকে দরজার দিকে দৃষ্টি দিতেই চমকে উঠলেন সমীর। ও সামসুলের কাছে কেন? এ তো কৃপাপ্রার্থীর গলা নয়! এ যেন ষড়যন্ত্রের গোপনীয়তার সঙ্গে জরুরী খবরের উত্তেজনা মেশামেশি করে রয়েছে! সমীর উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ করে উঠলেন, শোনার চেষ্টা করলেন কথাগুলো।

"আসেন, আসেন, আমার পাশেই বসেন। আপনি আসবেন জানতাম।"

হুজুর শিশুর সারল্য নিয়ে স্বাগত জানালেন আনন্দবাবুকে।

আনন্দবাবু হুজুরের মুখোমুখি বসে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন। কুমার তৎপর হয়ে উঠলেন ছবি তুলতে।

এই রুমটা যথেষ্ট বড়। চোদ্দ বাই আঠারো ফুট হবে, মেঝেতে পুরু কার্পেট। এক দিকে দেওয়াল ঘেঁসে একটা পুরু সাদা গদীতে যিনি বসে আছেন তিনিই যে হুজুর আনোয়ার চিশতী, বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। হুজুরের পরণে ধবধবে সাদা লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী। মাথায় সাদা টুপির সঙ্গে পেচাঁনো রয়েছে সাদা কাপড়। বাঁ পাশে সাদা তোয়ালে। ঠিক সামনে সাদা ম্যসোনাইট লাগান কাঠের জল চৌকি। বাঁ পাশে কার্পেটের ওপর ঝক্‌ঝকে রূপোর একটা বিশাল রেকাবিকে থোকা-থোকা আঙুর, আপেল ও কমলার স্তুপ, কয়েকটা জলের বোতল, স্টিলের বাটি, বেতের চুপড়ি।

ঘরে আলী কবীর ও আনোয়ার চৌধুরী ছাড়া আরো তিনজন বসে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন আলী কবীর। জনাব আমিনুল হক, ইলেকট্রনিকের ব্যবসা আছে ঢাকায়। শাহ আলম, পেশায় জাদুকর। মাহমুদ চৌধুরী, চিত্রভিনেতা, ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট। তিনজনের মধ্যে কয়েকটা বিষয়ে খুব মিল। পরণে পাঠান মুসলমানদের মতই চোপা-চাপকান, স্বাস্থ্যবান, হুজুরের পরম ভক্ত।

দুধ-ধবল সুন্দরী এক তরুণী ঘরে ঢুকলেন হালকা গন্ধ ছড়িয়ে হালকা হাওয়ার মতই। দু'হাতে ধরা ঝক্‌ঝকে রূপোর ছোট ট্রেতে দুটি লাল গোলাপের ছোট এবং সুন্দর তোড়া। হুজুরের কাছে হাটু গেড়ে বসে ট্রেটি ধরলেন। হুজুর একটি তোড়া তুলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন আনন্দবাবুর দিকে। অন্যটি দিলেন কুমারকে। মেয়েটি সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

হুজুর কুমারের দিকে মুখ ফেরালেন, "আপনার নামটা একটু বলবেন ?"

"কুমার রায়।"

"খুব ভাল। আপনি তো ফটোগ্রাফার হিসেবে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন, আরো এগোবেন। আপনি আসেন, আপনারে দুয়া দিয়ে দেই।"

কুমার চোখ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে হুজুরের পাশে বসলেন।

'কু-র কু-র' হুজুরের পাশে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। ফোন ধরলেন আলী।

কুমারের শরীরে তিনবার ফুঁ দিলেন হুজুর। কুমার উঠে দাঁড়ালেন। আলী রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন হুজুরের দিকে। হুজুর বার কয়েক 'হু'-'হ্যাঁ' করে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার।

হুজুর আনন্দবাবুর দিকে ফিরলেন, "আপনাকে আলী কাগজ-পত্র দিয়েছে না?"

"কী ধরনের কাগজ-পত্রের কথা বলছেন?"

"আমার সম্বন্ধে জানতেই তো আপনার আসা, সে বিষয়ে মুখে আর কত বলব। আলীই আপনাকে সাহায্য করবেন।"

আলী মৃদু স্বরে বললেন, "হ্যাঁ সে সব দিয়ে দিয়েছি।"

কুমার ছবি তুলতে তৈরি হয়েছেন। আলী এগিয়ে এলেন আনন্দ বাবুর কাছে।

"আপনার ক্যাপটা একটু খুলবেন?"

আলীর কথায় আনন্দবাবু মুহূর্তের জন্য বিব্রত বোধ করলেন। অস্বস্তিটা ঢাকতে চাইলেন কথার মাধ্যমে, "টাক ঢাকতে টুপি সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা। তাই..."

ক্যাপটা খুলে পাশে নামিয়ে রেখে আনন্দবাবু হুজুরকে বললেন, "আজ আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দেখার তীব্র আগ্রহ নিয়েই আমাদের আসা। কোনও দম্পতির হাতের ডিম সেদ্ধ করে দেওয়া দেখে তারপর লিখব, এই ইচ্ছে নিয়েই আসা।"

আনন্দবাবুকে মাথা থেকে টুপি খুলতে বলায় কুমারের মাথায় মুহূর্ত মধ্যে একটা চিন্তাই আঘাত করল—আলী কবীর কি আনন্দদাকে চিনতে পেরেছেন? আনন্দদার ছবি কি আগে দেখেছেন কোনও পত্র-পত্রিকায় বা বইতে? পত্রিকা জগতের লোক আলী আনন্দবাবুর বিষয়ে জানতেই পারেন, তাঁর ছবি দেখতেই পারেন।

হুজুর আলীর দিকে ঘুরলেন, "যা তো ওনার ইচ্ছে পুরণের একটা ব্যবস্থা কর।"

আলী বেরিয়ে গেলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন এক দম্পতিকে নিয়ে।

"আপনি একটু পিছিয়ে বসেন। এই সময় ছবি তুলবেন না।"

আনন্দবাবুকে ও কুমারকে পর্যায়ক্রমে বললেন হুজুর।

আনন্দবাবু পিছিয়ে একটু পাশ ঘেঁসে বসলেন, যাতে ডিম সেদ্ধর পুরো ঘটনাটা ভালমত দেখা যায়।

হুজুরের মুখোমুখি যাঁরা এসে বসলেন, তাঁদের মুখের দিকে তাকালেন আনন্দবাবু। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়ানো এবং এখানে ওখানে বসার চিহ্ন চুলে পোশাকে। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়েছে বলেই মনে হলো। পরণে পাজামা ও সুতির সাদা পাঞ্জাবী। হাতে আংটি, চোখে চশমা. শীর্ণ শরীর। মহিলাটি স্থূলকায়া, ফর্সা হাতে একগাদা গ্রহরত্নের আংটি।

"দু'জনেই হুজুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম জানালেন।"

"আপনাদের সন্তান নেই?"

"না?" ভদ্রলোকই উত্তর দিলেন।

"কত বছর বিয়ে হয়েছে?"

"এগারো বছর।" ভদ্রলোক বললেন।

"না, না, বারো বছর।" মহিলাটি উত্তরটা দিয়ে চোখ কুঁচকে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক ওই দৃষ্টির সামনে কিছুটা গুটিয়ে গেলেন, মনে হলো।

"ডিম এনেছেন?"

"হ্যাঁ।"

কোলে রাখা ফোমের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সন্তর্পণে একটি ঠোঙা বের করলেন। ঠোঙা থেকে বের করলেন একটি মুরগীর ডিম।

হুজুর হাত বাড়ালেন স্টিলের বাটিটার দিকে। বাটিটা রাখলেন সাদা জলচৌকিটার ওপর। একটা জলের বোতল তুলে নিয়ে জল ঢাললেন বাটিতে। ডিমটা চেয়ে নিয়ে বাটিতে রাখলেন।

দু'হাতের কোনওটাতেই অন্য কোনও ডিম যে লুকোন ছিল না,

সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন আনন্দবাবু।

দু'হাতে কচ্‌লে কচ্‌লে ডিমটাকে ধুলেন হুজুর। তুলে নিলেন জলে ভেজা ডিমটি। টপ্‌ টপ্‌ করে জল পড়ছে ডিমের গা থেকে। পাশে রাখা তোয়ালেতে ডিমটা মুছে মহিলাটিকে বললেন, "ধরুন মা!"

মহিলাটি ডিমটি ধরলেন।

"আপনি ডিমটা কাঁচা এনেছিলেন তো?"

হুজুরের কথায় মহিলাটি আপ্লুত গলায় বললেন, "হ্যাঁ বাবা।"

"আল্লার রহমত হলে ডিমটা সেদ্ধ হবে। নতুবা নয়।"

"আপনাকে সেদ্ধ করে দিতে হবেই বাবা।"

"আমি সেদ্ধ করার কে? আমি আল্লার কাছে শুধু আপনার হয়ে দোয়া করতে পারি। রহমত করা না করা তাঁর ইচ্ছে।"

হুজুর ডিমে তিনবার ফুঁ দিলেন। ডান হাতে তুলে নিলেন একটা চামচ। চামচটার হ্যাণ্ডেল দিয়ে ডিমটায় বার কয়েক ঠুকতেই খোলাটা ফেটে গেল। অবাক কাণ্ড ডিমটা সেদ্ধ হয়ে গেছে।

হুজুর শিশুর সরলতা নিয়ে হাসলেন। রসিকতা করে বললেন, "সেদ্ধ ডিম নিয়ে এসে বললেন কাঁচা ডিম এনেছেন? নিন, ডিমটা খেয়ে নিন। খোসা ফেলুন ওদিকের পাত্রে।"

খোসাগুলো পাশের একটি চুবড়িতে ফেলে ডিমটাকে মুখে ফেলেই মহিলাটি কান্নায় ভেঙে পড়লেন হুজুরের পায়ে। আনত হলেন মহিলার স্বামীটিও।

ঘটনার আকর্ষিকতায় আনন্দবাবু হতবাক্‌। বিস্ময়ে কুমারেরও চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার যোগাড়।

দম্পতি বেরিয়ে যেতেই হুজুর ফিরলেন আনন্দবাবুর দিকে। "কাছে আসেন।"

হুজুরের আহ্বানে আনন্দবাবু কাছে গিয়ে বসলেন। আনন্দবাবুর সমস্ত চেতনা বিস্ময়ের আবেশে অবশ হয়ে রয়েছে।

"সাইকেলের স্পোকে বলবেয়ারিং থাকে দেখেছেন?"

হুজুরের কথার জবাবে ঘোরে থাকা মানুষের মতই মৃদু স্বরে জবাব

দিলেন আনন্দবাবু, "হ্যাঁ।"

"কাল বলবেয়ারিং-এর একটা বল নিয়ে আসবেন।"

"কটায় আসব?"

"ঠিক নটায় চলে আসেন, সোজা চলে এসেন এখানে, দরজায় ওরা আটকাবে না।"

কুমারের দিকে ফিরে বলেন, "আপনিও চলে আসেন। ছবি তোলার অনেক বিষয় পাবেন। তবে আজ যে সব ছবি তুললেন, কাল তার একটা করে কপি আনেন।"

বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি কুমারেরও। শ্রদ্ধায় প্রকাশ করতে মাথা কিছুটা ঝুঁকিয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই আসব।"

হুজুর এ-বার আনন্দবাবুর হাতে একগুচ্ছ আঙুর তুলে দিলেন পাশের রেকাবি থেকে। হাসলেন সেই শিশু সারল্য ছড়িয়ে, "আপনার নামটা যেন কী?"

"দিলীপ নন্দী।"

"আপনে তো দিলীপ নন।" ঠোঁটে এখন সেই হাসি।

আনন্দবাবু ডাঙায় তোলা মাছের মতই কয়েকবার খাবি খেলেন। হুজুর কি সন্দেহ করেছেন? অথবা, আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন? কি ভাবে জানলেন? অলৌকিক ক্ষমতায়? অথবা ফোনটাই জানিয়েছে? ফোন? না, অলৌকিক ক্ষমতা? আনন্দবাবুর বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দটা বুঝিবা হুজুরের কানেও ধরা পড়ে যাবে।

"আমার ডাক নামটা আনন্দ। আনন্দ নামটাই আমার বেশি চালু।"

"হ্যাঁ আনন্দ, ওই নামেই মানুষ চেনে।" আবার হাসলেন হুজুর —নিষ্পাপ হাসি।

"জলটা পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হচ্ছে?"

হুজুর জলের বোতলটাই এগিয়ে দিলেন আনন্দবাবুর দিকে, "এটা নিয়েই যান।"

হুজুরের নিষ্পাপ হাসির অদ্ভুত জাদু। হাত বাড়ালেন আনন্দ-

বাবু। হুজুরের কথায় বা চক্ষুলজ্জায় ভুল করতে রাজি নন। জলটা পরীক্ষা করাতে হবে।

"না, না, বোতলের জলে কিছু নেই। জলটা পরীক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিলাম ডাঃ শ্যামল রায়চৌধুরীকে। তিনি একটু আগে ফোন করে জানিয়েছেন—প্লেন ওয়াটার। আমি কিন্তু চণ্ডীবাবুর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কৌশল একটা কোথাও আছে, যেটা আমরা ধরতে পারছি না। যাক, চণ্ডীবাবুর মতামত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তাতেই আবার ফিরে আসি। চণ্ডীবাবু, তাহলে আপনি বলছেন, কোনও কৌশল নেই ?"

আনন্দবাবুর কথায় এমন একটা খোঁচার সুর ছিল, যা চণ্ডীবাবুকে পীড়িত করল। কিছুটা অস্বস্তিও অনুভব করলেন তিনি। বিশাল প্রচার পাওয়া এমন একটা নামী, দামী মানুষকে আনন্দবাবু অনেকের সামনে এভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলবেন, এবং তা সহ্য করতে হবে ?

জাতুকর সি. সি. সরকারের ঠোঁটে সব সময়ের জন্য লেগে থাকা হাসিটা এই মুহূর্তে কে যেন শুষে নিয়েছে। চণ্ডীবাবু বার ত্বয়েক জিভ দিয়ে ঠোঁটটাকে চেটে নিয়ে বললেন, "আমার ধারণার কথা তো আগেও জানিয়েছি, আবারও জানাচ্ছি, হুজুর চিশতী কোনও কৌশল গ্রহণ না করেই ডিম সেদ্ধ করেছেন। কৌশল গ্রহণ করেননি বলার কারণ, তাঁর কৌশল গ্রহণের কোনও সুযোগ ছিল না। তিনি আমার চোখের সামনে ডিম সেদ্ধ করেছেন, পামিং করে ডিম পাল্টে দেননি, এটুকু বলতে পারি।

"এ তো গেল আমার ধারণা। আপনিও তো দেখছেন। দেখে আপনার কি ধারণা হলো ?" আনন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন চণ্ডীবাবু।

"আমার ধারণা, কারণ ঠিকই আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কারণটা আমাদের জানা নেই। কারণটা আমরা এখনও ধরতে পারিনি। হুজুর আমার পরিচয় জেনে ফেলেছেন। কিন্তু কি করে ? এটাও আমার কাছে একটা বড় প্রশ্ন।"

আজ সকালের অভিযানের রিভিউ করতে বসেছেন যুক্তিবাদী সমিতি বা র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা। কালকের তুলনায় ভিড়টা বেশি। স্থানটাও পরিবর্তিত হয়েছে। আজ সভ্যরা বসেছেন অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে। বউবাজারের এই অফিসটা আসলে ডাঃ সুজিত মল্লিকের চেম্বার। বিকেল পাঁচটা থেকে এটাই হয়ে যায় যুক্তি বাদীদের আড্ডাখানা। পেশেণ্টদের বসার জন্য রয়েছে কিছু গদী আঁটা চেয়ার ও সোফা। এতেই জনা চল্লিশ ভালোমতোই বসতে পারেন। আছে একটা টি· ভি, একটা ব্ল্যাকবোর্ড, একটা বড় কাঠের আলমারি যাতে ফাইল, খাতা-পত্তর, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস থাকে। একটা টেবিল আছে ব্ল্যাকবোর্ডের পাশে, টেবিলের ড্রয়ারে চক্ আর ডাস্টার মজুত। এক পাশের দেওয়ালে চারটে পেরেকে ঝুলছে সুতোয় বাঁধা একগুচ্ছ সাদা কাগজের টুকরো।

পিংকি একেবারে পিছনের সোফায় বসে একটা কাঁচা ডিম ও একটা সিদ্ধ ডিম নিয়ে একমনে হাতের কৌশলে ডিম দুটো পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। পাশেই চায়ের দোকানে, বিসকুট ছাড়া ওমলেট, ডিম সিদ্ধও মেলে। সেখান থেকেই ডিম দুটো কিনে এসেছে পিংকি, ডিম রহস্য নিয়ে মাথা খেলাতে। কিন্তু মুশকিলটা হলো, একবারের জন্যেও রঘুদার চোখ এড়িয়ে ডিম পাল্টে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

"সুধীরকুমার, আপনি তো হুজুরকে ডিম সেদ্ধ করতে দেখেছেন, আপনার কি মনে হয়েছে ?" আনন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সুধীরকুমার সব সময়ই অতি উৎসাহী। এই মুহূর্তে সেই অতি উৎসাহের ভগ্নাংশও লক্ষ্য করা গেল না। বার কয়েক মাথার চুলে বাঁ হাতটা বোলালেন। তারপর বললেন, "হুজুর চিশতী বেজায় চালাক। আমাকে দেখেই বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, আমার সঙ্গে চালাকী করে সুবিধে হবে না। তাই আমার সামনে কিছু দেখাতেই সাহস করেন নি। ডিম সেদ্ধ করার আগে আমাকে নীনার পেছনে বসতে বললেন। তাই সেদ্ধ করার ব্যাপারটা ভাল করে দেখার সুযোগই পাইনি।"

"নীনা কিছু বুঝতে পেরেছেন?" আনন্দবাবু একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করলেন।

"ও বলছিল, মানে ওর ধারণা, হুজুর চিশতী যা ঘটিয়েছেন, তা অলৌকিক উপায়েই ঘটিয়েছেন। মানে সব কিছুই তো আর চিটিংবাজি নয়। আসলে বলতে চাইছি, যাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করছেন, তাঁদের দাবির পরীক্ষা নিচ্ছি, এইমাত্র। কেউ পরীক্ষায় পাশ করলে, তাঁর দাবি মেনে নেব, এই তো ব্যাপার। এ তে সমস্যা কোথায়? কিন্তু এখানে এভাবে আলোচনা চলছে, যেন যে কোনও উপায়ে দাবিটা বাতিল করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।"

সুধীরকুমারের কথা শেষ হতেই দেবু উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাল, "সুধীরদা তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এখনও কিশোর ব্রহ্মচারীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারনি। আমরা সম্ভাব্য সমস্ত রকম ভাবে পরীক্ষা না গ্রহণ করেই মতামত জানাতে পারি না।"

সুধীরকুমার বছরখানেক আগেও কিশোর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। শুধু শিষ্য নন কিশোর ব্রহ্মচারীর শিষ্যদের নিয়ে গড়ে ওঠা কিশোর বাহিনীর কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। এখনও মাঝে-মধ্যে যে অলৌকিক বিশ্বাসগুলো একটু-আধটু মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তা ওঁর কথা শুনলে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

দেবু একটু ঝাঁঝালো স্বভাবের। বয়স কুড়ি এক মুখ দাড়ি-গোঁফ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি লম্বা, রোগা, ট্রাউজার, হাফ হাতার সুতীর পাঞ্জাবী এবং চপ্পল পরা দেবুর ইমেজটা ওর কলেজের বন্ধুদের কাছে 'উগ্রপন্থী'।

সমীর একটা স্লিপ ছিঁড়ে তাতে কিছু লিখে এগিয়ে দিলেন আনন্দর কাছে। আনন্দবাবু কাগজটা পড়ে ভাঁজ করে প্যাণ্টের ডান পকেটে চালান করলেন। কাছাকাছি থাকলে দেখা যেত এই মুহূর্তে আনন্দবাবুর কপালে সামান্য কয়েকটা রেখা পড়েছে, ভুরু দুটো কাছা-কাছি হয়েছে, চোখ দুটো হয়েছে সরু।

পিংকি ডিম পাল্টাবার খেলা চালিয়েই যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে সুজিত

জেঠুর ডক্টর'স রুমে ঢুকে অ্যাপ্রোণ আর তোয়ালে নিয়ে অ্যাপ্রোণ গায়ে চাপিয়ে তোয়ালেতে ঢেকেছে মাথা হুজুর চিশতীর মতো। আর অ্যামেচার জাদুকর রঘু, পিংকির ফাঁকি ধরার কাজটুকু চালিয়ে যাচ্ছিল। পিংকি হঠাৎ খেলা বন্ধ করে বার তিনেক মাথা ঝাঁকিয়ে একটা স্লিপ টেনে নিয়ে খস্‌খস্ করে দু-চার লাইন লিখে আনন্দবাবুর হতে দিয়ে এলো।

আনন্দবাবু কাগজটা পড়ে প্যাণ্টের ডান পকেটে চালান করলেন। আনন্দবাবুর খুব কাছে কেউ থাকলে দেখতে পেতেন একটা হাসির রেখা ঠোঁটের ফাঁকে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল।

"তমাল, একটু চা বা কফি হবে না?" আনন্দবাবু স্লিপের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন।

"হচ্ছে আনন্দদা।"

কথাটা বলেই তমাল বেরিয়ে গেল।

আনন্দবাবু টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে স্লিপের এক একটা টুকরোয় দু'চার লাইন করে লিখতে লাগলেন আর এক এক জনের নাম ডেকে তাঁদের হাতে ধরিয়ে দিতে লাগলেন স্লিপগুলো।

২৩শে ডিসেম্বর

এখন দশটা পঁয়তিরিশ। বাইরে আজ দর্শনার্থীর ভিড় আরো বেশি। আজ অ্যাসোসিয়েশনের আরো বেশি সংখ্যায় সভ্যরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন এটুকু বুঝতে পিংকির অসুবিধে হয়নি। পিংকিকে আজ অবশ্য চেনা মুশকিল। পরনে সিল্কের চোগা চাপকান, চোখে হালকা রঙের সান-গ্লাস, গালে নরম দাড়ি-গোঁফ। পিংকির বয়স বছর চৌদ্দ হলেও উচ্চতা পাঁচ সাড়ে সাত। ওজন সত্তর কেজি। তাই সিনেমার মেকাপম্যান অমরদা পিংকির মুখে নকল দাড়ি-গোঁফ সেঁটে দেওয়ার পর আঠারো-বিশের এক মুসলমান তরুণ ছাড়া আর কিছুই মনে হওয়ার কথা নয়, হয়ওনি—এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাইনে

দাঁড়িয়ে অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজনের মুখোমুখি হয়ে পিংকির এই ধারণাটাই দৃঢ় হয়েছে। পিংকির সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েছেন পিংকির মা প্রীতি। তাঁকে দেখে পরিচিতেরা চিনে ফেলবেন এবং সেই খবর পৌঁছে যাবে হুজুরের এজেন্টদের কাছে, এই সম্ভাবনাও শূন্য। প্রীতির শরীরের পুরোটাই প্রায় চকলেট রঙের চিনা সিল্কের বোরখায় ঢাকা। অনাবৃত অংশ বলতে শুধু হাতের পাঞ্জা দুটি ও পায়ের পাতা দুটি। মেহেন্দী রাঙানো হাত ও জড়ির কাজ করা নাগড়া পরিহিত পা প্রীতি আজ নূরজাহান আহমেদ এবং পিংকি নূরজাহানের ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করছে। নাম ফারুক চৌধুরী।

মিনিট পনের আগে সমীরদাকে হোটেলে ঢুকতে দেখছে পিংকি। এখন প্রত্যাশা করছে যে কোনও মুহূর্তে ওদের ভেতর ঢোকার ডাক আসবে। বাবা কুমারদাকে নিয়ে ভেতরে গেছেন ঠিক ন'টায়।

"আজ তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না বলে কিছু মনে কোরো না। এক ব্যাটা সাংবাদিক সেজে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। তার ওপর একটু নজর রাখতে হবে। ব্যাটা কাল অনেক লোকজন নিয়ে ঝামেলা পাকাতে তৈরি হয়ে এসেছিল। সুবিধে করতে পারিনি। আজকেও লোকজন এনেছে কিনা, আনলেও কতজন; সে খবরটা পাইনি।" সামসুল সমীরকে একান্তে একটা রুমে টেনে নিয়ে গিয়ে কথাগুলো বললেন।

সামসুলের চোখ-মুখের চেহারাতেই সমীর উত্তেজনা লক্ষ্য করেছিলেন। সমীর জিজ্ঞেস করলেন, "গোয়েন্দাগিরি করছেটা কে? কোনও পীর বা তাঁর দলের লোক?"

"না, না, সে ব্যাপার নয়। এ ব্যাটা আবার সব পীর, সাধুদেরই পেছনে লাগে। ফালতু লোক।"

"সাংবাদিক যখন নয়, জানতেই পেরেছ, তখন ব্যাটাকে ঘাড় ধরে বার করে দাও। তেমন দরকার হলে, তুমি বা তোমাদের পক্ষে অশান্তি করার অসুবিধে থাকলে আমাকে দেখিয়ে দাও; ঘাড় ধরে বিদায়

করে দিচ্ছি।”

“আরে সেখানেও অসুবিধে রয়েছে। লোকটা যদি আনন্দ ঘোষ না হয়ে সত্যিই সাংবাদিক দিলীপ নন্দী হয়, তাহলে ঝামেলা পাকাতে গেলে নিজেরাই ঝামেলায় পড়ে যাব।”

“তোমাদের যে খবর দিয়েছে, তার কাছ থেকেই ভালমত কনফার্ম হয়ে নাও না।”

“খবরটা আমাদের কোনও ইনফরমারের বা সোর্সের কাছ থেকে আসেনি। উপযাচক হয়ে ফেমাস ম্যাজিসিয়ান সি, সি সরকার স্বয়ং খবরটা দিয়েছেন কাল। আজ তো সি, সি সরকারকেও লাইনে দেখছি না। ও এক নম্বর স্টান্টবাজ লোক। ওর কোন্‌টা যে সত্যি কোন্‌টা যে মিথ্যে, বোঝাই মুশকিল। ধান্দা ছাড়া কিছু বোঝে না। ট্র্যাবলিং এজেন্ট হিসেবে ওঁর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। বেশ কিছু বিদেশ ট্যুরের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত লোকটাকে বুঝতে পারলাম না। অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারে পুরো বিশ্বাস আছে আবার প্রগতিশীল ইমেজ তৈরি করতে আনন্দ ঘোষের দলে ভিড়েছেন।”

“তুমি তো আমার পুরোন বন্ধু, রাজনীতির পোড় খাওয়া লোক, আমাকে একটু মদত দেবে?”

“সঙ্কোচ না করেই বলে ফেল। সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয়ই সাহায্য করব।”

“দিলীপবাবু ওর ফটোগ্রাফার নিয়ে এখন আছেন এগার নম্বর ঘরে। আলীভাই ওকে অ্যাটেণ্ড করছে। আমরা যে কোনও মুহূর্তে কিছু তথ্য হাতে আসার অপেক্ষায় আছি। তথ্যগুলো এসে গেলে ব্যাক্তিটি দিলীপ কি আনন্দ, পরিষ্কার হবে। ওঁদের ঘণ্টা দুয়েক হলো নানা ছল-ছুতোয় আটকে রেখেছি এগার নম্বরে। কিন্তু আর বোধহয় আটকে রাখা সম্ভব হবে না। হুজুরের সামনে ওঁদের হাজির করতে হবে এবার। আমি চাই তুমিও ওই সময় হুজুরের সামনে হাজির থেকে দিলীপবাবুর ওপর নজর রাখো। কোনও গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টা করলে একজন নিরপেক্ষ দর্শনার্থী হিসেবে তুমি

দিলীপবাবুর বিরোধিতা করবে। তুমি রাজী হলে তোমার করণীয় কাজগুলো ডিটেলসে বোঝাতে পাঁচ মিনিট সময় নেব।"

"আমি রাজি। কিন্তু আজ আবার কেন এলাম তা তো জিজ্ঞেস করলে না তো?"

"হয়তো জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, কিন্তু এতো ঝামেলায় কি মাথা ঠিক রাখার উপায় আছে বন্ধু?"

"আমাদের সঙ্গে পড়ত নাসিরুদ্দিন আহমেদকে মনে আছে? সেই যে রাজারহাট থেকে আসত। পরণে থাকত আলিগড় পাজামা আর পাঞ্জাবী।"

"হ্যাঁ মনে পড়েছে। খুব ফর্সা, দাড়ি রাখত। তা ওর খবর কী?"

"ভালই। মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। বিয়ে করেছে বছর আটেক। স্ত্রীর নাম নূরজাহান, ছেলে-পিলে নেই। ওর শ্যালক ফারুক চৌধুরী উচ্চ-মাধ্যমিক দেবে এবার। আমার ছাত্র। ওকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। ফারুক জানাল, দিদি নূরজাহান সন্তান কামনায় হুজুরের কাছে এসেছেন ওকে সঙ্গী করে। ওদের যদি একটু তাড়াতাড়ি দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতে তোমার অসুবিধে হবে না হয় তো……"

মুখের কথাটা শেষ করতে না দিয়ে সামসুল বললেন, "আরে, কি যে বলো! এক্ষুনি তোমার সঙ্গে একজন কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওঁদের নিয়ে এসো।"

"এই ডিমে তো হবে না। ডিমটা দাগী। দ্যাখতেছেন না, ডিমের রঙটা পুরোপুরি সাদা না। আল্লার দোয়া পেতে সাদা ডিম আনতে হয়, মুরগীর ডিম।"

হুজুর ডিমটি ফিরিয়ে দিলেন তাঁর সামনে বসে থাকা মহিলাটির হাতে।

"একটা সাদা মুরগীর ডিম কিনে নিয়ে আসছি বাবা।" মহিলাটির কণ্ঠস্বরে আকুতি।

"না এবার আর হবে না। দু'মাস পরে আবার আসছি। পত্রিকা পড়েন তো? পত্রিকায় নজর রেখেন। খবর পেয়ে যাবেন। তখন দেখা করেন।"

অগত্যা দম্পতি উঠে পড়লেন। সামসুল এবার যাঁদের নিয়ে ঢুকলেন, তাঁদের দেখে সতর্ক ও উত্তেজিত হলেন আনন্দ ও কুমার। সামসুলের সঙ্গী প্রীতি, পিংকি ও সমীর।

প্রীতিকে হুজুর চিশতীর মুখোমুখি বসতে বলে সামসুল হুজুরকে বললেন, "আমার বন্ধুর বিবি।"

প্রীতির পাশেই বসেছে পিংকি। প্রীতি আর পিংকির মাঝখানে চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগটি রেখে প্রীতি ওর মুখ থেকে বোরখার পরদা সরালেন।

"নাম কি বহিন?"

"নূরজাহান আহমেদ।"

পিংকিকে দেখিয়ে হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে হয়?"

"আমার ভাইজান।"

"তোমার নাম কি ভাইজান?"

"ফারুক চৌধুরী।"

"সমস্যাটা কার?"

"আমারই। আট বছর আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনও ছেলে-পুলে কিছু হয়নি। অনেক ডাক্তার, হেকিম দেখিয়েছি। অনেকেই ভরসা দিচ্ছেন। কিন্তু আশার আলো তো দেখতে পাচ্ছি না, আপনিই আমার শেষ ভরসা।"

"ডিম এনেছো বহিন?"

"হ্যাঁ।"

"দেখি আর একটু এগিয়ে এসে বোসো, ডিমটা বের করে হাতে ধর।"

প্রীতি ওর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বের করলেন একটি ডিম। ডিমটা হাতে ধরলেন, ব্যাগটা নামিয়ে রাখলেন।

হুজুর আনোয়ার চিশতী পাশে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন স্টীলের বাটি। হুজুরের মুখোমুখি প্রীতি, প্রীতি বাঁয়ে পিংকি। প্রীতির ডাইনে বসে আলী কবীর, আনোয়ার চৌধুরী, আমিনুল হক, মাহমুদ চৌধুরী। আনন্দবাবু দাঁড়িয়ে আছেন পিংকির বাঁয়ে একটু তফাতে। আনন্দবাবুর পাশে আরো তিনজন-সামসুল, সমীর ও কুমার।

দরজার মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন জনৈক স্বাস্থ্যবান যুবক, দরজার বাইরে উত্তেজিত জনতা। ওঁদের আনন্দবাবু দেখতে না পেলেও ওঁদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছিলেন। দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছিল বহুর চিৎকার। তার মধ্যে দু-জনের গলা একস্ট্রাস্ট্রং। সেই দুটি গলা থেকে এই ধরনের কিছু কিছু কথা ভেসে আসছিল, "পীরের কাছেও যদি সব মানুষ সমান বিচার না পায়, তবে সে আবার কেমন পীর?" "পত্রিকার লোক বলে কি মাথা কিনেছে? কাল প্রচুর সময় নষ্ট করেছে, আজও করবে।"

হুজুর স্টীলের বাটিটা জলচৌকির ওপর রাখলেন। বোতল তুলে নিলেন। বাটিতে জল ঢাললেন। পিংকি ও প্রীতির মাঝখানে জল-চৌকির সামনে গদীর ওপর পড়ে রয়েছে প্রীতির চামড়ার ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগ। হুজুর ডিমটা নিলেন প্রীতির হাত থেকে। পিংকির ডান হাত ভ্যানিটি ব্যাগের চেন খুলল। একটা রুমাল বের করে নাক ঝেড়ে রুমালটা রাখল ব্যাগের ওপর। ডিমটা এখন বাটিতে। জলে কচলে কচলে ডিমটা ধুচ্ছেন হুজুর। আনন্দবাবু প্যাণ্টের ডান পকেটের ওপরে ডান হাতটা বুলিয়ে বুড়ো আঙুলের সামান্য চাপে চালু করে দিলেন সোনিও টেপ রেকর্ডারটা। হুজুর কোল থেকে তোয়ালেটা তুলে নিলেন ডান হাতে, বাঁ হাতে ডিমটা। ডিমের গায়ে লেগে থাকা জলটা তোয়ালেতে মুছে প্রীতির হাতে দিলেন।

আনন্দবাবু উত্তেজনায় টানটান। উত্তেজিত পিংকি। এবার কি ঘটবে? সত্যিই কি ডিমটা সেদ্ধ হয়ে যাবে?

"আপনি ডিমটা কাঁচা এনেছিলেন তো?" হুজুরের অসাধারণ সরলতা মাখা কথাগুলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ হুজুর।" প্রীতি বললেন।

"আল্লার রহমত হলে ডিমটা সেদ্ধ হবে, নতুবা নয়।"

"হুজুর, আপনার রহমতই আল্লার রহমত।" প্রীতি পাক্কা অভিনেত্রীর মতই শ্রদ্ধা ও আবেগ মিশিয়ে কথাগুলো বললেন।

হুজুর ডিমে তিনবার ফুঁ দিলেন। ডান হাতে তুলে নিলেন একটা চামচ। চামচটার হ্যাণ্ডেল দিয়ে ডিমের খোলায় দু'বার ঠুকতেই, কি আশ্চর্য! খোলা থেকে বেরিয়ে এলো সেদ্ধ ডিম।

হুজুর রসিকতা করে বললেন "সেদ্ধ ডিম নিয়ে এসে আমাকে…"

কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই বিকট চিংকার করে লাফিয়ে উঠলেন হুজুর, "ওরে বা-প-রে…"

হুজুর উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে নিজের লুঙ্গি ধরে ঝাড়তে লাগলেন। কোলের তোয়ালে উড়ল শূন্যে। তোয়ালে থেকে ঝরে পড়ল একটা কাঁচা ডিম, লুঙ্গির ভেতর থেকে ঝরে পড়ল কালিয়া, পিংকির পোষা কালনাগিনী।

কুমার তৎপরতার সঙ্গে ক্যামেরায় সাটার টিপে যাচ্ছেন। তোয়ালে থেকে ঝরে পড়া ডিমটা কার্পেটে পড়ে ফাটাল। পিংকি চোখের পলকে ঝাঁপাল ডিমটার দিকে। ডিমটা তুলে নিয়ে এক ঝলকে পরীক্ষা করে চেঁচাল, "এটাই তো আমাদের ডিম, ডট পেনে করা আমার সই রয়েছে। সেদ্ধ ডিমটা আমাদের নয়, ওটায় সই নেই। বাবা তোয়ালের ভাঁজে একটা সেদ্ধ ডিম রেখে দিয়েছিলেন আগেই। সেটাই পাল্টে দিয়েছেন। এই ঘরেই কোথাও সেদ্ধ ডিমের স্টক পাবেন। ডিম সেদ্ধ করতে হলে ওখান থেকে একটা সেদ্ধ ডিম নিয়ে তোয়ালেতে লুকিয়ে রাখতেন। তারপর দরকার মত সেদ্ধ ডিমটা তোয়ালের ভাঁজ থেকে বের করে তোয়ালের আড়ালে লুকিয়ে ফেলতেন কাঁচা ডিমটা।"

"ঠিকই ধরেছ বাছা। কিন্তু এই ধরাই যে তোমাদের কাল হল। ক্যামেরা কেড়ে নে। ফটোগ্রাফার রিপোরটার, ফারুক, নূরজাহান আর সমীর, সবগুলোকে আপাতত ঘুম পারিয়ে রাখ। পরে ব্যবস্থা হবে। মৃতেরা কোন দিনই কথা বলে না।

হুজুরের টানটান গলায় উত্তেজনা ফেটে পড়ছে।

সামসুলের কোমর থেকে বেরিয়ে এলো ছোট একটি রিভলবার, আলী কাবীরের হাতে চকচকে একটা ছুরি।

"মাহমুদভাই ওদের হাতে চটপট একটা করে ইঞ্জেকসন ফুঁড়ে দেন।" চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বললেন আলী কবীর।

সমীর হঠাৎ হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে সামসুলের পা জড়িয়ে ধরলেন, "তুমি আমার পুরোন বন্ধু। আমাকে মের না, আমি এ সবের মধ্যে নেই। এখানে যা দেখেছি, যা শুনেছি, কাউকে বলব না, কথা দিচ্ছি।

দ্বিধাগ্রস্থ সামসুল তাকালেন হুজুরের দিকে। ঠিক সময়টি বেছে সমীর সামসুলের দুটি পা ধরে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকাটান দিল। সামসুল ছিটকে পড়লেন সপাটে। হাতের রিভলবার থেকে গুলি গেল ছিটকে। প্রথম শব্দটা 'গু-ড়ু-ম'। তারপরেই 'ঝন্ ঝন্ ঝন্' জানালার কাঁচে লেগেছে গুলিটা।

রিভলবারটা ছিটকে পড়তেই পিংকি লেভ ইয়াসিনের মত ডাইভ দিল রিভলবার লক্ষ্য করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডান পায়ের উরুর পেছন দিকে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল।

পিংকিকে লক্ষ্য করে ছুরিটা ছুঁড়েছিলেন আলী কবীর। মাহমুদ চৌধুরী গুলির শব্দ শুনে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতে ফার্স্ট এইড বাক্স থেকে সদ্য বের করা ইঞ্জেকসন সিরিঞ্জটা। প্রচণ্ড হুংকার ছেড়ে শূন্যে লাফালেন মাহমুদ, লক্ষ্য আনন্দবাবু। আনন্দবাবুর হাতে এই মুহূর্তে উঠে এসেছে ব্যাগি প্যাণ্টের তলায় কোমরে লুকিয়ে রাখা রিভলবারটা।

'গু-ড়ু-ম'। আনন্দবাবুর রিভলবারের আওয়াজ ও মাহমুদের আর্তনাদ প্রায় একই সঙ্গে বেরিয়ে এলো। ঘর কাঁপানো আওয়াজ। মাহমুদের ডানবাহুতে গুলিটা লেগেছে। ধড়াম করে আছড়ে পড়লেন ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট মাহমুদ চৌধুরী। রিভলবার ঘুরল। আনন্দবাবুর রিভলবারের লক্ষ্য এবার হুজুর।

"আপনার দলের লোকদের বলুন গোলমাল পাকাবার চেষ্টা না করতে। খুন করতে চাইলে খুন হতেও পারেন, এটা মনে রাখবেন। আর লক্ষ্যটা যে আমার খুব একটা খারাপ নয়, তা তো দেখতেই পেলেন।"

আনন্দবাবুর গলার স্বর, তীব্র দৃষ্টি ও মুখের চেহারা দেখে হুজুরের সাহায্যকারীরা বুঝে নিয়েছেন—কথাগুলো আদৌ ফাঁকা আওয়াজ নয়।

পিংকির হাতেও এই মুহূর্তে রিভলবার। পায়ে হাত বুলিয়ে বুঝেছে ছুরিটা গেঁথে নেই, চামড়া কেটে বেরিয়ে গেছে, তবে রক্ত ঝরছে প্রচুর।

প্রীতি পিংকির রক্ত দেখে একটু বিহ্বল হয়ে পিংকির দিকে এগিয়ে গেলেন। পিংকি হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বলল, "কিচ্ছু হয় নি, প্লিজ ডোণ্ট ডিস্টার্ব।"

অবস্থা ঘোরাল। এখন বোধহয় দাঁড়িয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। ঠোঁটে দাঁত চেপে পিংকির রক্ত ঝরা পায়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রীতি। ওঁর দু'চোখ জলে টলটল করছে।

সমস্ত ঘটনাটা পড়তে যতক্ষণ লাগল, ঘটল তার ভগ্নাংশ সময়ে।

ইতিমধ্যে গোলমালের আওয়াজে বাইরে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে হুজুরের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে! ঘরে এখন অনেক মানুষ। ঘর ছাপিয়ে বারান্দা ছাপিয়ে সিঁড়ি বেয়ে শুধুই মানুষ, মানুষ আর মানুষ। ঘরে মিলেমিশে রয়েছেন র‍্যাসানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের লড়াকু ছেলেরা ও হুজুরের মস্তান বাহিনী। মস্তান বাহিনীরা গুণ্ডামীতে যথেষ্ট পেশাদার। গোলমাল পাকালে জনরোষ তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে, এটুকু তারা বুঝে নিয়েছে। বঞ্চিত, ক্ষুব্ধ মানুষগুলোকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য, ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য আনন্দবাবুর সঙ্গী-সাথীরা যে জনগণের মধ্যেই মিশে রয়েছে—এটুকু অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি হুজুরের চামচাদের। স্পষ্টতই ওরা বুঝে নিয়েছে, লড়াই চালাতে গেলে সেটা হয়ে অসম লড়াই, আত্মহত্যার সামিল।

পিংকি ওর রঙচঙে কালিয়া নামের নির্বিষ কালনাগিনীটিকে বের করল হুজুরের ছুই তাকিয়ার ফাঁক থেকে। মায়ের ব্যাগে চালান করে দিয়ে চেন বন্ধ করল।

উত্তেজিত জনগণের উত্তেজনা ও প্রচুর প্রশ্নকে সামাল দেবার দায়িত্ব এই মুহূর্তে তুলে নিয়েছেন আনন্দবাবুর দলের দামাল ছেলেরা। কৌতূহলী জনতার হাজারো প্রশ্ন, হাজারো মন্তব্য—"গোলমাল কেন দাদা?" "মন্তরে কখনো সন্তান হয়?" "যত্তোসব হাতে-নাতে ধরা পড়েছে?" "ডিম তবে সেদ্ধ হচ্ছিল কেমন করে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর যিনি দিতে পারবেন, সেই আনন্দবাবু মুখ না খোলা পর্যন্ত অবস্থা সামাল দেবার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন যুক্তিবাদী সমিতির ছেলেরা। একই সঙ্গে নজর রাখতে হচ্ছে হুজুরের দলের লোকগুলোর ওপর।

"অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারতবর্ষ, খাজা মইনুদ্দিন চিশতীর দেশ ভারতবর্ষ। এই দেশে এসেছি সব সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষের সেবা করতে। অহিংসার এ-দেশে আমরা কী হিংসার বলি হবো? গুণ্ডামোর শিকার হবো? মীমাংসার ভার ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের ওপর।"

হুজুর একঘর মানুষের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন উত্তেজনা রোধ করে কণ্ঠে শিশুর সরলতা ফিরিয়ে এনে।

কবীর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আনন্দবাবু কবীরের উদ্দেশ্যে বললেন, "দাঁড়ান, আমি কিছু বলবো না, বলবে এই টেপ্-রেকর্ডারটা, যেটা নিরপেক্ষ ও নিস্পৃহভাবে আমাদের প্রত্যেকের কথা-গুলোই ধরে রেখেছে গোপনে।"

"পিংকি!"

আনন্দবাবুর আহ্বানে পিংকি উঠে গিয়ে তৎপরতার সঙ্গে বাবার প্যান্টের ডান পকেট থেকে বের করল ছোট্ট টেপ-রেকর্ডারটা। আনন্দ-বাবুর ডান হাতে এখনও রিভলবার, যে কোনও মুহূর্তে গুলি উগরে দিতে তৈরি।

পিংকি রেকর্ডারের সুইচ টিপে ক্যাসেটটা ব্যাক করাচ্ছে। ঘরে

অস্বাভাবিক স্তব্ধতা, শুধু ক্যাসেট ব্যাক করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এই বিপুল স্তব্ধতা কী আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস ?

পিংকি সুইচ টিপল স্টপের, তারপরে প্লের।

"আপনি ডিমটা কাঁচা এনেছেন তো ?......"

বাজতে লাগল টেপ রোকর্ডার।

"গুড়ুম" রিভালবারের শব্দটার পর পিংকির টেপ বন্ধ করতেই হলো। উত্তেজিত জনতার ক্রোধ ও ঘৃণা থেকে যে চিৎকারের শুরু হলো, তাতে টেপ চালিয়ে রাখাটা নেহাতই অপ্রয়োজনীয়।

ঠিক এমনি সময় দ্রুত ঘরে ঢুকলেন পার্কস্ট্রিট থানার ও. সি. পার্থ গাঙ্গুলী, সঙ্গে কয়েকজন কনেস্টবল ও উজ্জ্বল রায়।

উজ্জ্বলই থানায় গিয়ে ও, সি,কে ডেকে এনেছেন।



কুয়ালালামপুরের অলৌকিক মোমবাতি



[illegible]

[illegible]

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

সিঙ্গাপুর থেকে এবার কুয়ালালামপুর, উঠতে হবে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন সিস্টেম-এর বিমানে। এয়ারপোর্টে যিনি এগিয়ে এসে আনন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আর ইউ ইণ্ডিয়ান?" তাঁর কথার উচ্চারণ শুনে ও চেহারা দেখে পিংকি অনুমান করে নিল—ভদ্রলোক দক্ষিণ ভারতীয়। পরিচয় হলো—এন, শ্রীনিবাসন। তিরিশ বছর ধরে কুয়ালালামপুরের বাসিন্দা, ওখানে ব্যবসা করেন, হোটেল-ব্যবসা। বয়স বছর পঞ্চাশ, টক্‌টকে গায়ের রঙ, সুন্দর স্বাস্থ্য, বছরে একবার দক্ষিণ ভারতে দেশের বাড়ি যান। আনন্দবাবু, প্রীতি ও পিংকিকে দেখে, ওদের কথা শুনে বুঝেছিলেন ভারতীয় এবং বাঙালী।

গল্প-সল্প করতে করতে প্লেনে ওঠার সময় হলো। ঘড়ির কাঁটায় তখন স্থানীয় সময় রাত এগারোটা পঁচিশ। একজন এয়ার হোস্টেস আনন্দবাবুদের ও শ্রীবাসনকে আগে পিছনে ছুটো সীটে বসিয়ে দিলেন। পিংকিও প্রীতি বসলেন পাশাপাশি। অন্যটায় আনন্দবাবু ও শ্রীনিবাসন। বাকি যাত্রীদের অধিকাংশই উগ্র সাজ-পোশাকের তরুণ। চক্‌রা-বক্‌রা শার্ট, ফেড জিনসের প্যাণ্ট লম্বা চুল। কারো এক কানে ছুল, কারও বা চুলে বিনুনি বাঁধা।

প্লেন ছাড়তেই উগ্র সাজের তরুণদের উগ্রতা প্রকাশ পেল। হৈ-চৈ, প্লেনের মধ্যেই হুড়োহুড়ি, সিটি বাজল—সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

শ্রীনিবাসন আনন্দবাবুর চোখের অবাক ভাষা পড়ে জানালেন, "এরা সব বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে। সকালের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর গিয়েছিল ড্রাগের নেশা করতে। শেষ ফ্লাইটে বাড়ি ফিরছে।"

"কিন্তু নেশা করতে সিঙ্গাপুর কেন?" আনন্দবাবুর কথায় তখনও বিস্ময়।

"মালয়েশিয়ায় ড্রাগের চোরাচালানের শাস্তি মৃত্যু। জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে এখানে কেউ ড্রাগ ব্যবসা করে না। তাই বড়লোকের এইসব বখে যাওয়া ছেলেরা নেশা করতে সকালের ফ্লাইটে যায় সিঙ্গাপুর, রাতের ফ্লাইটে ফেরে। উইক-এণ্ডের শেষ ফ্লাইটে নেশাড়ুদের ভিড় থাকে সবচেয়ে বেশি।"

শ্রীনিবাসনের কথায় আনন্দবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠল ভিসার ওপর স্ট্যাম্প মারা বড় বড় অক্ষরগুলো—"যে-কোনও ড্রাগ চোরাচালানের শাস্তি মৃত্যু।" প্রীতির আবার হোমিওপ্যাথিতে প্রবল আস্থা। হোমিওপ্যাথির স্যুগার মিল্ক বা সাদা পাউডারকে ড্রাগ ভেবে মালয়েশিয়ান পুলিশরা যদি নাজেহাল করে, এই ভেবেই এই প্রথম হোমিওপ্যাথি ওষুধ সঙ্গে নেননি প্রীতি।

আনন্দবাবু ওরফে আনন্দ ঘোষ থাকেন দমদমের দেবীনিবাসে, তিন ঘরের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছুঁয়েছে, কিন্তু পোশাক-আশাকে, তৎপরতায়, মাঝে-মাঝেই সদ্য তরুণ হয়ে যান। বাস্তবিকই মাঝে-মাঝে, কারণ মাঝে-মাঝে তাঁর শরীর থেকে ব্যাগি পোশাক বিদায় নেয়। ওঠে পাজামা বা ট্রাউজারের সঙ্গে খাদির হাতা কাটা পাঞ্জাবী। মাঝারি উচ্চতা, শ্যামলা রঙের উজ্জল চোখের এই লোকটিকে একই সঙ্গে দেখা যায় বুদ্ধিজীবী ও আদিবাসীদের সঙ্গে সমানতালে আড্ডা দিতে। পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী হলেও নেশা লেখা ও সত্যানুসন্ধান। সত্যানুসন্ধানী বলতে প্রচলিত অর্থে আমরা গোয়েন্দাকেই বুঝি, আনন্দবাবু তা নন। অলৌকিক ক্ষমতার দাবি-দারদের দাবির যথার্থতা অনুসন্ধান করেন। প্রীতির কথায়, "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।" এই নেশার সূত্রেই আনন্দবাবু গড়ে তুলেছেন একটি সংস্থা—'যুক্তিবাদী সমিতি' ইংরেজিতে 'র‍্যাশনালিস্টস অ্যাসোশিয়েশন'।

"আনন্দবাবুর সংসারে আছেন স্ত্রী প্রীতি, ছেলে পিনাকী, ডাক নাম পিংকি ও প্রীতির ঘরের কাজকর্মের সঙ্গী লক্ষ্মী সোরেন।

প্রীতি সুন্দরী, সাজতে ভালবাসেন। নতুন নতুন খাবার রাঁধতে ভালবাসেন। ঘরসাজান ও রান্না-বান্না নিয়ে মাঝে-মধ্যে মেয়েদের

পত্র-পত্রিকায় লেখেন। 'সুর-সঙ্গম'-এ গান শেখান,বাড়িতে মেলা ছাত্র-ছাত্রী আসে, গান করেন বেতার ও দূরদর্শনে। সেই সুবাদে জলসায় গাইতে হয়। ঈশ্বর ও অলৌকিকত্বে পরম বিশ্বাস এনেছিলেন পিতৃকূল থেকে। প্রীতির দাদা দুলালবাবু তো দস্তুরমত তন্ত্রসাধনা করেন। ছোট-বোনের জামাইও পরম তন্ত্রভক্ত এবং এক তান্ত্রিকের দীক্ষিত। বর্তমানে প্রীতির সেই বিশ্বাসে অবশ্য অনেকটাই চিড় ধরেছে।

পিংকি ওরফে পিনাকী আনন্দবাবু ও প্রীতির একমাত্র ছেলে ও সন্তান। পিংকি মায়ের মতই লম্বার ধাত পেয়েছে। পড়ে দমদম সেণ্ট মেরিজ স্কুলে ক্লাস নাইনে। ক্যালকাটা ক্যারাটে ক্লাবে ক্যারাটে শেখে। কয়েক মাস হলো বাবা একটা মোটরবাইক কিনেছেন, সেটা এখন পিংকির সর্বক্ষণের সঙ্গী। লেখা-পড়ার ভালইবাসে, তবে তারচেয়েও ভালবাসে গল্প লিখতে, দুষ্টুমি করতে, বই পড়তে ও ম্যাজিক দেখাতে।

লক্ষ্মী সোরেন এসেছে পুরুলিয়া থেকে, বয়স বারো। লম্বায় সাড়ে চার ফুটের বেশি বাড়েনি। কালো গায়ের রঙ, ফোলা ফোলা চক্চকে গাল। প্রীতির কাছে শেখে লেখা-পড়া আর গান! কথায় কথায় ঝরনার মত হাসে।

কুয়ালালমপুর পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল। এয়ারপোর্টের বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন কে. ভেঙ্কটরাঘবন। আনন্দবাবুদের দেখেই হাত নাড়লেন। গত পুজোয় ভেঙ্কটের সঙ্গে প্রথম আলাপ। কুয়ালালামপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও ভারতের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েই গেছে। চারদিনের জন্য কলকাতায় এসে পিংকিদের বাড়িতেই উঠেছিলেন। কুয়ালালাপুরে দক্ষিণ-ভারতীয় সিল্ক-শাড়ির দোকান আছে। সেই সুবাদে বছরে অন্তত বার চারেক ভারতে আসতে হয়। মাদ্রাজের র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক টি.বিশ্বনাথন ভেঙ্কটরাঘবনের কলেজ জীবনের বন্ধু ছিলেন। বিশ্বনাথনের সুবাদেই আনন্দবাবুর সঙ্গে ভেঙ্কটরাঘবনের চিঠিতে যোগাযোগের শুরু গত জানুয়ারিতে। তারপর গত দুর্গাপুজোতেই প্রথম কলকাতায় এলেন।

উঠেছিলেন এয়ারপোর্ট হোটেলে। আনন্দবাবুর অনুরোধেই হোটেল ছেড়ে আনন্দবাবুর ডেরায় কয়েকদিনের জন্য আস্তানা গাড়েন। আড্ডাবাজ লোক, ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, ইংরেজি উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট। যথেষ্ট যুক্তিবাদী, ওঁর কাছেই শোনা ১৫১১ সাল থেকে মালয়েশিয়া ছিল পর্তুগিজদের অধীনে। ১৯৪২ থেকে ৪৫ পর্যন্ত ছিল জাপানীদের অধীনে। '৫৭ সালের ৩১ আগস্ট পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। মালয়েশিয়ার বর্তমান জনসংখ্যা এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাত্র। এর মধ্যে চীনা বংশজাত পঞ্চাশ লক্ষ, এবং ভারতীয় বংশজাত মানুষ ষোল লক্ষ। ভারতীয়দের মধ্যে শিখ এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশি। বাকি মালয়ের আদিবাসী-মালয়ী। মালয়ীদের বেশিরভাগই ধর্মে মুসলমান। মালয়ীরা দক্ষিণ ভারতীয়দের বলে 'তামিল'। মালয়ীরা তামিলদের বেশ ভয়ের চোখে দেখে। ওদের ধারণা, তামিল মাত্রেই মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাক জানে। ওরা ওইসব মন্ত্র বলে মানুষের ভাল বা খারাপ যা খুশি করতে পারে!

এমনটা ভাবার কারণ, প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে মালয়েশিয়ায় তামিলদের বিশাল উৎসব হয় 'থাইপুসম'। তাতে যে-সব অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা তামিলরা দেখায়, সেগুলো দেখলে যে কোনও মানুষের বুকের রক্ত বুঝিবা ভয়ে হিম হয়ে যাবে। এই উৎসব দেখতে প্রতিবছরই বহু দেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক আসেন।

ভেঙ্কটরাঘবন জানিয়ে ছিলেন, পেটালিং জায়ায় তামিলদের নিয়ে র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গড়ার কাজ কিছুটা এগিয়েও থমকে আছে। কারণ, স্থানীয় জনসাধারণের প্রশ্নে একটাই, 'থাইপুসম' অনুষ্ঠানে যে-সব অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটে, সেগুলো যদি অলৌকিক নাই হয়, তবে সেগুলোর পিছনে ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যা ভেঙ্কটরাঘবন ও তাঁর সঙ্গীরা দিতে পারেন নি। ভেঙ্কটরাঘবন আনন্দবাবুকে তাই অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন আগামী ফেব্রুয়ারিতে কুয়ালালামপুরে উপস্থিত থেকে উৎসবের ঘটনাগুলো নিজে দেখে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো বুঝিয়ে দেন। প্রীতি ও

পিংকিকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওই উৎসব দেখার জন্য।

কাস্টমস-এর হাঙ্গামা চুকিয়ে ওঁরা যখন ভেঙ্কটের টয়োটায় উঠেছেন তখন শ্রীনিবাসন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন। একগাল হেসে আনন্দ বাবুকে বললেন, "আরে আপনিই তবে আনন্দ ঘোষ? মিস্টার ভেঙ্কট অবশ্য আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন। আপনি তো দারুণ ইনটারেসটিং ক্যারেকটার। আপনার ছেলেটিও কম যায় না। কাল সকালেই আপনার সঙ্গে দেখা করছি।"

ভেঙ্কট থাকেন পেটালিং জায়ায়। দূরত্ব দমদম এয়ারপোর্ট থেকে সল্টলেকের মতই। পেটালিং জায়ায় পৌঁছলেন তখন প্রায় রাত দুটো। পেটালিং জায়া কলকাতার সল্টলেকের দ্বিতীয় সংস্করণ। উচ্চমধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের নানা ডিজাইনের বাড়ি ও হাউসিং কমপ্লেক্স। ভেঙ্কটরাঘবন থাকেন চার ঘরের একটা আধুনিক হাজার দুয়েক স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। অত্যাধুনিক আসবাবপত্র সাজান, বাড়িতে সব সময় থাকার মানুষ দুটি। একজন কেয়ারটেকার কাম ম্যানেজার সেলিম মুস্তাফা, অন্যজন রাঁধুনে বৈদ্যনাথ গণেশন, সেলিম বছর তিরিশের চটপটে ছেলে। নামাজ পড়ে না, র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গড়ার বিষয়ে ভেঙ্কটকে উৎসাহ যোগায়। বৈদ্যনাথ গণেশন মোটাসোটা কৃষ্ণবর্ণের মধ্যবয়সী মানুষ, কম কথা বলে। ভক্ত লোক। আর কোথাও জায়গা করতে না পেরে নিজের ছোট্ট ঘরের দেওয়ালে যতটুকু ফাঁক পেয়েছে তা দক্ষিণ ভারতীয় দেবদেবীদের ছবিতে ভরিয়ে দিয়েছে।

আনন্দবাবুরা পৌঁছতেই সেলিম তৎপরতার সঙ্গে জানালেন, "মিস্টার ও মিসেস ঘোষের জন্য একটা রুম ঠিক করা আছে, জুনিয়র ঘোষের জন্যও একটা।"

কথাটা বলেই ভেঙ্কটের দিকে তাকিয়ে রসিকতার সুর মিলিয়ে সেলিম বললেন, "কিন্তু স্যার, আপনি যাকে জুনিয়র বলেছিলেন তাকে তো দেখছি দস্তুর মত মিস্টার!"

ভেঙ্কটও হেসে ফেললেন, "তা যা বলেছ, জুনিয়র বললে পিংকিও

এখন বোধহয় রাগ করবে।”

পিংকি ক্লাস নাইনে পড়লেও এই পনের বছরেই লম্বায় দস্তুরমত পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি অতিক্রম করে গেছে। ওজন তিয়াত্তর কেজি, জুতোর মাপ বাটার ন-নম্বর। লাইসেন্স ছাড়াই এনফিল্ড মোটর বাইকে মা'কে এখানে-ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসে। ট্রাফিক পুলিশ কোন দিনই নাবালক সন্দেহে ধরেনি। এ হেন পিংকিকে জুনিয়র বললে স্বভাবতই মনে দাগা লাগতেই পারে।

পিংকি শুধু বলল, “আমাকে পিনাকী বা পিংকি বলে ডাকলেই খুশি হবো।”

“খুব ভাল, তাই হবে।” বলে পিংকির পিঠে বিশাল থাপ্পড় বসালেন ভেঙ্কট।

সে রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে গণেশন খাওয়ালেন কফি ও বিস্কিট। এখানকার লোকেরা বোধহয় খুব কড়া কফি পছন্দ করেন। কফির কাপে চুমুক দিয়েই পিংকির মনে হলো। আর ঠিক সেই সময় ওর মনে পড়ল ইংলিশ টিচার যোসেফ-এর কথা, “রাত জেগে পড়ার পক্ষে কড়া কফি সবচেয়ে ভাল ওষুধ। পিংকি দ্বিতীয় চুমুক দিয়েই প্রায় ভর্তি কফির কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল, ও এখন ঘুম তাড়াতে মোটেই ইচ্ছুক নয়।

সকালে শ্রীনিবাসন এলেন, সঙ্গে মেয়ে পদ্মিনী। ক্লাশ এইটে পড়ে। পরনে দক্ষিণ ভারতীয় পোশাক, প্রচুর কুঁচি দেওয়া বড় ঘেরের গাঢ় সবুজ রঙের সিল্কের সায়া, সবুজ হাতাওয়ালা হলদে সিল্কের ব্লাউজ ও পাতলা সাদা ওড়না। অসম্ভব সুন্দরী মেয়েটিকে প্রীতি থুতনিতে হাত দিয়ে আদর না করে পারলেন না। আদর করতে করতে ভাবছিলেন, ইতিহাসের রানী পদ্মিনী কী এত সুন্দরী ছিলেন ?

শ্রীনিবাসন ভেঙ্কটকে প্রস্তাব দিলেন, “থাইপুসম উৎসব তো কাল। আজ বরং আন্দবাবুদের নিয়ে জেন্টিং হাইল্যাণ্ডস ঘুরে আসি।”

ভেঙ্কটও রাজি হয়ে গেলেম। শ্রীনিবাসনের মিৎসুবিসি ভ্যানে

সকলে পাড়ি জমালেন। সকলে মানে আনন্দবাবু, প্রীতি, পিংকি, শ্রীনিবাসন, পদ্মিনী ও ভেঙ্কট।

কুয়ালালমপুরের সবচেয়ে কাছের পাহাড় জেন্টিং হাইল্যাণ্ডস। গাড়ি চালাচ্ছিলেন শ্রীনিবাসন। শ্রীনিবাসনের পাশেই পিংকি। গাড়ি যখন পাহাড়ের কেব্‌ল-কার স্টেশনে এসে থামল, তখন পিংকি মিটার পড়ে দেখল, সাতচল্লিশ কিলোমিটার এসেছে।

রবিবার, কেবল কারে প্রচুর লোক উঠছেন, নামছেন। এঁরা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মানুষ। বিচিত্র এঁদের পোশাক-আশাক। মেয়েদের পরনে সিল্কের ট্রাউজার, টি-শার্ট, হাফপ্যান্ট গাউন, মিডি ইত্যাদিই বেশি। পোশাকে আমেরিকার ছোঁয়াচ।

কেব্‌ল-কারে চেপে পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা পিংকির এই প্রথম। কেব্‌ল-কার একটু দোল খেতে খেতে হু-হু করে উঠছে। পিংকির একটু ভয় ভয় করলেও পদ্মিনীর সামনে মনোভাবটা আদৌ প্রকাশ করতে রাজি নয়। পদ্মিনীর যে একটুও ভয় করছিল না, তা ওর হৈ-চৈ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

পাহাড়ের ওপরে আনন্দের হরেকরকম ব্যবস্থা রয়েছে। সুইমিং পুল, গলফ্‌ খেলার মাঠ, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, হোটেল—কোনও কিছুরই অভাব নেই। ছোটদের চড়ার জন্য রয়েছে ভিনটেজ কারের মত মোটর গাড়ি। পিংকি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় পড়েছে, ভারতেও এই ধরনের ভিনটেজ কারের আদলে মোটর গাড়ি তৈরি করে একটা কোম্পানী। একটা অডিটোরিয়াম চোখে পড়ল! সন্ধে থেকে রাত পর্যন্ত এখানে নানাধরনের অনুষ্ঠান হয়। মালয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্যাসিনো বা জুয়ার আড্ডাও এই জেন্টিং হাইল্যাণ্ডস-এ।

সুইমিং পুল দেখে পিংকি তার আক্ষেপ প্রকাশ করে ফেলল পদ্মিনীর কাছে, "ইস্ একটা সুইমিং কস্টিউম পেলে দারুণ হতো।"

পদ্মিনী ওর রেশমের মত চুলে ঝট্‌কা মেরে বলল, "নো প্রবলেম।"

পদ্মিনী দৌড়ে গেল ওর বাবার কাছে। পনের মিনিটের মধ্যেই শ্রীনিবাসন দুটো কস্টিউম কিনে হাজির হলেন। একটা ওয়ান পিস্

একটা টু পিস্। সুইমিং ক্লাবে পোশাক পাল্টাবার জন্য ডেসিংরুমে রয়েছে, পোশাক রাখতে রয়েছে লকার।

সুইমিং ক্লাবের লাগোয়া একটা দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তরাঁয় বসে আনন্দবাবুরা মশলা দোসা খাচ্ছিলেন। কলকাতায় দোসা দেয় পাটিসাপটা পিঠের মত পাকিয়ে অথবা পরটার মত ভাঁজ করে। ভাঁজের ভিতরে থাকে তরকারি, বাটিতে দেওয়া হয় সবজি মেশান ডাল, যাকে বলে সম্বর, সঙ্গে থাকে ডালবাটা ও নারকোলবাটার চাটনি। এখানকার দোসার চেহারা শালপাতার ঠোঙার মত। ঠোঙার ভিতরে রয়েছে তরকারি, সঙ্গে কিছুটা মাংসের কিমা, একবাটি সম্বর, একবাটি পাতলা নারকোল-দুধ, ওপর নুন, মশলা গুঁড়ো ও লঙ্কা গুঁড়ো ছড়ানো। একটু ঝাল হলেও উপাদেয়। প্রীতি দোসার তারিফ করতেই ভেঙ্কট বললেন, "তাহলে আর একটা হয়ে যাক্।"

খাওয়া শেষ করে যখন কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিন ওঁরা, তখনই সুইমিং পুলের একজন উর্দিধারী কর্মচারী দৌড়ে এসে খবর দিল, "আপনাদের সঙ্গের ছেলেটির একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, শিগ্‌গির আসুন।"

ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও দৌড়ল পুলের দিকে। দাম মেটানোর সময় নেই। ভেঙ্কট কিছু মালয়েশিয়ান মুদ্রা রিংগিট টেবিলের অ্যাসট্রে চাপা দিয়ে আনন্দবাবুদের পিছু পিছু দৌড়লেন।

সুইমিং পুলের পাশে একটা জটলা, সেখানেই আবিষ্কার করা গেল পিংকিকে! বাঁ হাতে একটা গভীর লম্বা ক্ষত দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে আসছে। ক্লাবকর্মীরাই ফার্স্ট-এইড বক্স সামনে নিয়ে ওর রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। পিংকি অবশ্য শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে চাইছে। ওর মুখে-চোখে তেমন অতঙ্ক বা ব্যথার চিহ্ন লক্ষ্য করা গেল না।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হওয়ার পর পিংকির মুখেই শোনা গেল ঘটনাটা! পুলে বিভিন্ন বয়সী অনেকেই সাঁতার কাটছিল। হঠাৎ পিংকি অনুভব করল, কেউ যেন ওর পা ধরে নীচের দিকে টানছে। নীচে তলিয়ে গিয়ে

উঠতে চেষ্টা করতেই বুঝতে পারল ওপরে আরও একজন কেউ আছে, যে ওকে জলের ওপর মাথা তুলতে দিতে নারাজ।

দম ফুরিয়ে আসছিল। ওপরের লোকটার হাতের কয়েকটা আঙ্ুল শরীর মুচড়ে নিজর মুখের আওতায় পেতেই প্রচণ্ড শক্তিতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে। সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করেছে লোকটা জলে ডুব দিয়েছে। পিংকি নিজের মাথাটা জলের ওপর তুলতেই বুঝতে পারল আবার ওর পায়ে টান পড়েছে ডুব দিয়ে লোকটার মুখোমুখি হলো। লোকটা পিংকিকে মুখোমুখি হতে দেখে একটা ছুরি বের করল কোমর থেকে। বুক লক্ষ্য করে ছুড়িটা চালাল দারুণ ক্ষিপ্রতায়। জলের জন্য গতি কিছু কমে গিয়েছিল। ওর হাত চালান দেখেই ক্যারাটের ব্রাউন বেল্ট পিংকি দ্রুত নিজের বুককে লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিল। কিন্তু জল দ্রুততার পক্ষে প্রবল বাধা। ফল এই, বাঁ বাহুতে ইস্পাতের ফলা কামড় বসিয়েছে।

পিংকি শারীরিকভাবে দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়, বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী ঝুঁকি না নিয়ে পুলের অন্যান্য সাঁতার দিতে থাকা মানুষদের ভিড়ে মিশে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবেছে।

বেড়ানটা আর তারপর জমল না। প্রত্যেকেই কেমন গম্ভীর। প্রতিটি মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরছিল, এখানে কে পিংকিকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে? তবে কী কেউ থাইপুসম উৎসবের ধর্মীয় ব্যাপারে আনন্দবাবুর নাক গলান বন্ধ করতেই পিংকিকে হত্যা করতে চেয়েছিল?

আনন্দবাবুর অনুরোধ মতই আজকের দুপুরের ঘটনাটা পুলিশের নজরে আনা হয়নি। এখন রাত ন'টা। যুক্তিবাদী সমিতি গড়ায় উৎসাহী এগারজন তামিল ও তিনজন শিখ আড়াই ঘণ্টা ধরে অনেক কিছু আলোচনা ও পরিকল্পনা করার পর বিদায় নিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত একমত হয়েছিলেন—কাল সুব্রামনিয়ানের মন্দিরে অনেক ভক্ত অবতাররা যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাবেন, সেগুলোর ব্যাখা প্রেস কনফারেন্স করে হাজির করাত পারলে

এই শহরের বুকে র্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে। প্রতি বছরই ভারত থেকে দু-একজন দক্ষিণ-ভারতীয় অলৌকিক শক্তিধরের আবির্ভাব ঘটে উৎসবের দিন। তারপর সবচেয়ে সাড়া জাগানো অবতারটিকে নিয়ে বেশ কয়েকমাস ধরে চলে শহর জুড়ে হৈ-চৈ। এ বার ভারত থেকে এসেছেন কৃষ্ণ আয়ায়। তিনি নাকি অতিন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী।

আনন্দবাবু ভরসা দিয়েছেন, কালকে যে সব অলৌকিক ঘটনাগুলো ঘটবে, তার লৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

শ্রীনিবাসন, পদ্মিনী ও পদ্মিনীর মা এখনও বিদায় নেননি। পদ্মিনীর মা চল্লিশ ছুঁই ছুঁই মহিলা। এখনও অসম্ভব সুন্দরী। পেটালিং জাওয়ায় ভরতনাট্যম শেখাবার একটা স্কুল চালান। মহিলার নামটিও মহিলাটির মতই সুন্দর—তিলোত্তমা। প্রীতি গান করেন শুনে নৃত্য ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনায় মেতে গেলেন।

আনন্দবাবু ভেঙ্কট ও শ্রীনিবাসন গল্প করছিলেন, পিংকি ক্লোজআপ ম্যাজিক দেখিয়ে পদ্মিনীকে অবাক করে দিচ্ছিল। পদ্মিনী বলল, তুমি দারুণ ম্যাজিক দেখাও তো! তোমার ম্যাজিক দেখে তোমাকেও সুব্রামনিয়ান মন্দিরের পুরোহিতদের মতই অলৌকিক ক্ষমতাবান মনে হচ্ছে।

গর্বে পিংকির বুক ফুলে উঠল। এক্ষুনি আরও কঠিন ও আকর্ষণীয় কোন্ ম্যাজিকটা দেখিয়ে পদ্মিনীকে আরও বেশি অবাক করে দেওয়া যায় পিংকির দ্রুততার সঙ্গে সেই চিন্তা করতে লাগল।

১৯শে ফেব্রুয়ারি।

ব্রেকফাস্ট সেরেই আনন্দবাবুরা বেরিয়ে পড়েছেন। কুড়ি মিনিটেই পৌঁছে গেলেন বাটু কেভস্। এখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড় চুড়োয়। চুড়োয় সুব্রমনিয়ান মন্দির।

কাল রাতের কথামত সকলেই অপেক্ষা করছিলেন মাদ্রাজ রেস্তরাঁয়।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। আনন্দবাবুরা পৌঁছে দেখলেন, তাঁদের আগেই প্রত্যেকে হাজির হয়েছেন, সঙ্গে এসেছেন তাঁদের স্ত্রী ছেলে-মেয়েরাও।

তিলোত্তমা প্রীতির সঙ্গে তাঁর বান্ধবীদের আলাপ করিয়ে দিলেন। পিংকির কাছাকাছি বয়সের তিনটি ছেলে চারটি মেয়ে এসেছে। পদ্মিনী এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে পিংকির আলাপ করিয়ে দিচ্ছিল। ওরা সাতজনই যে ভাবে কালকের সুইমিং পুলের ঘটনাটা আবার পিংকির মুখে শুনতে চাইল এবং পিংকির হাতের ব্যাণ্ডেজের দিকে অবাক হয়ে দেখছিল তাতে পিংকি কিছুটা লজ্জা পেয়ে ওদের অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। জিজ্ঞেস করল তোমরা কেউ আগে কখনও এই মন্দিরে এসেছ?

প্রত্যেকেই জানাল, জ্ঞান হয়ে অবধি তারা প্রতিবছরই এই উৎসব উপলক্ষে আসে।

"তোমরা কখনও গুনে দেখছ, কটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উঠতে হয়?"

"৩৭২টি।"

উত্তরটা দিল বনি পিল্লাই। এক সাজু-গুজু কিশোরী। ওর পরনেও অন্যদের মতই বড় ঘেরের গাঢ় লাল সায়া। গাঢ় লাল চুমকি বসান ব্লাউজ ও ওড়না। দু-হাতের রঙিন কাঁচের চুড়ি প্রায় কনুই পর্যন্ত উঠেছে। চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক। কানে হিরের দুল, নাকে হিরের নাকছাবি।

বনিকে দেখে পিংকির আড়াই মাসের বড় মাসতুতো দিদি বনির কথা মনে পড়ে গেল। বনি নামের সব মেয়েরাই কী এমন সাজু-গুজু সুন্দরী হয়?

বনি তড়বড় করে জানাল, "আমি মুরুগানকে ভীষণ মানি। আমাদের বাড়ির ঠাকুরের আসনে মুরুগানের ছবি আছে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় আমি নিজের হাতে মুরুগানের সামনে মোমবাতি জ্বেলে দিই। মুরুগান দারুণ জাগ্রত দেবতা।"

মুরুগান কে? পিংকি বুঝে উঠতে পারল না, তবে দু-বনির

প্রগাঢ় ঈশ্বর ভক্তির মিল দেখে আশ্চর্য হলো। জিজ্ঞেস করল, "মুরুগান কে ?"

বনিকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে পদ্মিনী বলল, "সুব্রানিয়ানকেই আমরা নানা নামে ডাকি, যেমন মুরুগান, সন্মুগ, স্কন্ধ। মুরুগান হলেন গণেশের ভাই কার্তিক।"

বনিকে থামিয়ে পদ্মিনী উত্তর দেওয়ায় বনি বোধহয় খুব একটা সন্তুষ্ট হয়নি। কথার তোড়ে পদ্মিনীকে থামিয়ে দিল বনি, "মুরুগান রাক্ষস-রাজ তাড়কাকে বধ করেছিলেন। আজকের দিনটাও হলো যাবতীয় অশুভ নিধনের দিন।"

তাড়কাকে রাক্ষস-রাজ বলায় পিংকি একটু ধন্দে পড়ে গেল। বলল, "তাড়কা তো রাক্ষুসী, রাক্ষস-রাজ বললে কেন ?"

প্রত্যেকেই ইংরিজি মিডিয়ামেই পড়ে, অতএব পিংকির কথার অর্থ প্রত্যেকেই বুঝেছে। এবং বুঝেই সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

পিংকি বলল, "আমাদের দেশের কাহিনীতে তাড়কাকে মেয়ে হিসেবেই বলা হয়েছে। আর তাড়কাকে বধ করেছিলেন..."

কথাটা শেষ করার আগেই চিৎকার ও বাজনার হৈ-হট্টগোল বোঝা গেল ভক্তদের মিছিল এসে পড়েছে।

পিংকি তাকাল। জনসমুদ্র। দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েদের রঙ-বেরঙের পোশাকের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। মালয়ী দর্শক ও বিদেশী পর্যটকের সংখ্যাও কম নয়।

এসে পড়ল মিছিল। বেশ কিছু ভক্ত তাঁদের কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছেন খুব ভারী ধনুকের মতো লোহার একটা জিনিস। ধনুকটা রঙিন সিল্কের কাপড়ে ও ময়ূরপুচ্ছে সাজান। ধবধবে সাদা ধুতি লুঙ্গির মত করে পরেছেন ভক্তরা, অনাবৃত গা। পিছনে একই পোশাকের বহু ভক্ত সুর করে কিছু বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন। তাঁদের মাথায় একটা করে স্টেনলেস স্টিলের ঘড়া। ঘড়া থেকে চল্‌কে পড়ছে দুধ। ওদের কপালে বুকে পেটে ও পিঠে বড় বড় ছুঁচের মত শলাকা

বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিভ ও গালের দু-পাশ এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে রয়েছে স্টেনলেস স্টিলের সরু ত্রিশূল।

পদ্মিনী পিংকিকে নীচু গলায় বলল, "এ-সব শলাগুলো মন্দকে বিনাশের প্রতীক।"

বনির চোখে পরম বিস্ময়। পিংকির ডান হাতটায় টান দিয়ে বলল, "দেখছ! শরীরে এতগুলো শলাকা ঢুকিয়েও কেমন সুস্থ মানুষের মতই হাঁটা চলা করছে? স্বয়ং যিশুর শরীরে এতগুলো শলা ঢুকিয়ে দিলে তিনিও মারা পরতেন। সবই মুরুগানের অপার কৃপা।"

ভক্তদের মিছিলের পিছু পিছু আনন্দবাবুদের দলও সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলেন। তাঁদের অনুসরণ করছিলেন প্রীতিরা ও পিংকিরা। বিশাল ভিড় ঠেলে এগুনো চারটিখানি কথা নয়। বিদেশীদের অনেকেই হাতের ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা কাজ করে চলেছে।

পিংকি হঠাৎই অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ্য করল। কাল রাতে যাঁরা আনন্দবাবুর সঙ্গে পরিচিত হতে ও পরামর্শ করতে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজন নিজের পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করলেন। পড়লেন গিয়ে আনন্দবাবুর গায়ে। পিংকি সচেতন হয়ে হয়ে উঠল। টানটান উত্তেজনায় পড়ে যাওয়া লোকটিকে লক্ষ্য করল, কী যেন নাম? কী যেন নাম? বিজয় রামারাও। মাদ্রাজ রেস্তোরাঁর মালিক। শখের জাদুও একটু-আধটু জানেন। কিন্তু কেন এ-ভাবে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করলেন? পিংকির মাথায় এই প্রশ্নটাই বার বার হানা দিতে লাগল।

অভূতপূর্ব একটা ঘটনা পিংকির জন্য অপেক্ষা করেছিল। সুব্রমনিয়ানের মূর্তির সামনে একটা সোনার বড় রেকাবিতে করে কিছু বড় বড় সুদর্শন মোম এনে রাখলেন এক মুণ্ডিতমস্তক মোটা শিখার অধিকারী গৌরবর্ণ দক্ষিণ ভারতীয়। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু ভক্ত। পদ্মিনী উত্তেজিত গলায় পিংকিকে বলল, "ওই যে পুরোহিত রেকাবিতে

মোম নিয়ে এলেন, উনি কৃষ্ণ আয়ার, ম্যাড্রাসে থাকেন। দিন পনের হলো চারজন ভক্ত নিয়ে এই শহরে এসেছেন। উঠেছেন কোটিপতি ব্যবসায়ী বাসুদেবন আয়ারের পেটালাং জায়ার বাড়িতে। দারুণ অলৌকিক ক্ষমতা।"

কৃষ্ণ আয়ারের এক ভক্ত শিষ্য একটি একটি করে মোমগুলোকে বসিয়ে দিলেন একটি শ্বেত পাথরের বেদীর ওপর।

যাঁরা এতক্ষণ ঘড়ায় করে দুধ বয়ে আনছিলেন, তাঁরা দেবতার পায়ে ঘড়ার দুধ ভক্তির সঙ্গে উজাড় করে দিয়ে বেদীর সামনে হাজির হয়ে দুলে দুলে সুর করে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় মন্ত্রপাঠ করেছিলেন। দর্শকদের অনেকের দৃষ্টিই মোমবাতিগুলোর দিকে।

বনি পিংকির গা ঘেঁসে দাঁড়াল, বনির মুখের দিকে তাকাল পিংকি। ও এমনই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মোমগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে চোখ দুটো এখনই বোধহয় টপ্‌টপ্‌ করে খসে পড়বে। অন্যান্য ভক্তদের দিকেও চোখ বোলাল পিংকি, প্রত্যেকের চোখেই বিস্ময়কর কিছু দেখতে পাবার প্রত্যাশা।

বনি পিংকিকে বললো, "এদিক-ওদিক দেখছ কী, মোমগুলোর দিকে তাকও, দেখবে এখনি..."

বনির কথা শেষ হবার আগেই একটা মোমবাতি আপনা থেকেই জ্বলে উঠল। তারপর এক এক করে সবগুলো। ভক্তরা প্রচণ্ড চিৎকারে কৃষ্ণ আয়ার ও সুব্রমনিয়ানের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। মুভি ক্যামেরা ও ভি. ডি. ও. ক্যামেরাগুলো তৎপরতার সঙ্গে ঘুরে চলেছে। সেলুলয়েডের বুকে ধরে রাখছে অলৌকিক মুহূর্তকে। একটু তফাতে আনন্দবাবু সদলবলে দাঁড়িয়ে। তাঁদের চোখেও পরম বিস্ময়।

বাটু কেভস-এ নেমে আসতেই আর একটা বিস্ময় আনন্দবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎই লক্ষ্য করলেন তাঁদের দলকে ঘিরে ফেলেছেন মালয়ী পুলিশ বাহিনী। এক মালয়ী পুলিশ অফিসার

এগিয়ে এসে, "আপনাদের প্রত্যেকের তল্লাসী নিতে চাই।"

পুলিশ অফিসারটির কথায় যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রিয় মানুষগুলোর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ বিস্ময়।

ভেঙ্কট এগিয়ে এসে নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড অফিসারটির হাতে ধরিয়ে দিলেন। অফিসারটি কার্ডে চোখ বুলিয়ে বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন ভাবলেশহীন চোখে।

অসহায় ভেঙ্কট মুখ খুললেন, "আমাদের এই ক'জনকে যে দেখেছেন, এঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের মানুষ। প্রত্যেকেই মালয়শিয় সরকারের অনুগত। এভাবে আমাদের প্রকাশ্যে ঘিরে ধরে তল্লাসী চালাবার একটিই অর্থ, আমাদের সম্মানহানি। আপনি তেমনটা করলে এবং আপত্তিজনক কিছু না পেলে আমরা আপনার বিরুদ্ধে আদালতে সম্মানহানির অভিযোগে আনতে বাধ্য হবো।"

অফিসারটি যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো কিছুটা মাথা ঝুঁকিয়ে ভেঙ্কটের প্রতি বিনয় প্রকাশ করে ধীরে ধীরে বলে গেলেন, "আমাদের এমন একটা বিশ্রী কাজ করতে হচ্ছে বলে আপনাদের প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আইনরক্ষকের উর্দি গায়ে চাপালে ওপরওয়ালার নির্দেশ পালনই আমাদের মহান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই নির্দেশ পালন করতে অপ্রিয় কিছু কাজ এই মুহূর্তে করতে হচ্ছে। আশা করছি, আপনাদের সম্বন্ধে যে খবর পেয়েছি, তা নেহাৎই বাজে। আপনাদের মত সম্মানীয় ব্যক্তিদের কেউ ড্রাগ চোরাচালানোর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, এটা আদৌ প্রত্যাশিত নয়। তবু আমার অপারগ অবস্থার কথা ভেবে আপনারা আমার সঙ্গে পুরোপুরি সহযোগিতা করবেন এটা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করতে পারি?"

কথাটা শুনে ভেঙ্কট স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, "আমাদের কি থানায় যেতে হবে? যেতে বললে নিশ্চয়ই যাবো, তবে দয়া করে একটি কৃপা করবেন, আমাদের পুলিশ ভ্যানে তুলবেন না। আমরা নিজেদের গাড়িতেই আপনাদের পাহারায় যাবো।"

"না, না, থানায় আপনাদের যেতে হবে না। এখানেই তল্লাশী নিয়ে ছেড়ে দেব।"

ড্রাগের প্যাকেট সরিয়ে ফেলার কোনও সুযোগ দিতে যে রাজি নন পুলিশ অফিসারটি, এটা বুঝতে কারুরই অসুবিধে হলো না।

বিজয় রামারাও এগিয়ে এসে গদগদ গলায় বললেন, "স্যার, আমি মাদ্রাজ রেস্তোরাঁর মালিক। আপনি যদি দয়া করে পথের ওপর এমন প্রকাশ্যে তল্লাশী না নিয়ে রেস্তোরাঁয় তল্লাশী নেন তো আমাদের ইজ্জত কিছুটা বাঁচে।"

রামারাও-এর অনুরোধে কাজ হলো। অফিসারটি বললেন, "বেশ তাই হোক। আপনারা প্রত্যেকে দুটো হাতই মাথার ওপর তুলে দাঁড়ান। তারপর আমাদের ঘেরার মধ্যে থেকে এগুবেন।"

একগাদা পুরুষ ও মহিলা পুলিশদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে আনন্দবাবুরা ঢুকলেন মাদ্রাজ রেস্তোরাঁয়। রেস্তোঁরার একতলার ভিড় তখন গমগম করছে। অমন ভিড় দেখে পুলিশ অফিসারটি বিরক্তির সঙ্গে কাঁধ নাড়াতেই রামারাও এগিয়ে এসে বললেন, "দোতলায় চলুন স্যার, ওখানে কোনও খদ্দের নেই। ওই ফ্লোরে শুধু আমার আর ম্যানেজারের ঘর।"

"তাই চলুন। আপনারা একটুও হুড়োহুড়ি না করে আমাকে অনুসরণ করে উঠে আসুন।" কথাগুলো বলে অফিসার আনন্দবাবুদের প্রত্যেকের দিকে দ্রুত দৃষ্টির ঘোরাতে ঘোরাতে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলেন।

পেছন ফিরে সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন পুলিশ অফিসার। তাঁকে অনুসরণ করে উঠছেন আনন্দবাবুরা ও আইনের রক্ষকরা, প্রত্যেকের পেছনে একজন করে রক্ষক। ওপরে উঠতেই চোখে পড়ল চওড়া একটা বারান্দা। বারান্দায় গোটা পাঁচেক পুরু গদীর সোফা, কোণে একটা সতেজ রবার গাছ। পাশাপাশি দুটো ঘর। একটায় লেখা ম্যানেজার, অন্যটায়, প্রপাইটার। বারান্দার এক কোণে সকলকে দাঁড় করিয়ে বাজপাখির মত দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইল মালয়ী পুলিশরা।

হোটেল ম্যানেজারেই ঘরে এক এক করে নিয়ে গিয়ে তল্লাসী করা হতে লাগল। তল্লাশি শেষ হলেও নিস্তার নেই। হাত তুলেই পুলিশী পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বারান্দার অন্য প্রান্তে।

আনন্দবাবুর চিন্তায় বার বার একটা সন্দেহ উঁকি দিতে লাগল ; এই পুরো ঘটনাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়েছে। কী সেই গোলমাল ? কেউ কী আইনসম্মতভাবে আনন্দবাবুকে খুন করতে আনন্দবাবুর পকেটে ড্রাগের প্যাকেট চালান করে দিয়ে পুলিশকে ফোনে ড্রাগের হদিশ দিয়েছে ? তাই যদি হয়ে থাকে তবে কখন প্যাকেটটা পকেটে ঢোকাল ? এত ভিড় এত ঠেলাঠেলির মধ্যে যে কোনও পকেটমারের পক্ষেই ছোট একটা প্যাকেট অন্যের পকেটে চালান করে দেওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার। যুক্তিবাদী আন্দোলনের শত্রুরা যদি এমন ঘটনার পিছনে থাকে, তবে লক্ষ্য হিসেবে আনন্দ-বাবুকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি।

সম্ভাবনাটা মাথায় ঢুকতেই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরেও কুলকুল করে ঘেমে উঠলেন আনন্দবাবু। এখন পকেটে হাত দিয়ে দেখার কোনও সুযোগ নেই। আনন্দবাবুর পকেট থেকে ড্রাগ পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে এই মুহূর্তে আনন্দবাবুর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এত বেশি দেরিতে পরিষ্কার হল, যখন তাঁর কিছুই করার নেই। ভেঙ্কট ও তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চয়ই ভাবছেন, পুলিশ ভুল খবর পেয়েছে, অতএব ভয়ের কিছুই নেই। কিন্তু আনন্দবাবু একশো ভাগ নিশ্চিত, পুলিশের এই মাদক অভিযানের পিছনে রয়েছে এক গভীর চক্রান্ত। কিন্তু চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার মত একটা পথও মাথায় আসছে না ; ম্যাজিকের অনেক ছলাকলা জেনেও না। এখন শুধু অপেক্ষা, ধরা পড়ার অপেক্ষা, মৃত্যুর অপেক্ষা, এক প্রচণ্ড অপমানজনক মৃত্যুর অপেক্ষা। মালয়েশিয়ার যুক্তিবাদী আন্দোলন আন্দবাবুর নেতৃত্বে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তার ওপরও এসে পড়বে চরম আঘাত। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ভারতের নানা পত্রিকার ছবি, যে-গুলোতে প্রকাশিত হয়েছে মাদক পাচার করতে গিয়ে আনন্দ ঘোষের

হাতে-নাতে ধরা পড়ার খবর। আন্দোলনের সহযোদ্ধাদের মুখগুলো একে একে ভেসে উঠল। ওদের প্রায় কেউই খবরটা বিশ্বাস করবেন না। বুঝতে পারবেন, কোনও এক ষড়যন্ত্রের বলি হলেন আনন্দবাবু। ওঁরা তো অনেকেই দেখেছেন, এক একটা আন্দোলন ধ্বংস করতে কী ভাবে শাসকরা আন্দোলনের নেতাদের শেষ করেছেন, চরিত্রহনন করেছেন! নেতাদের পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করেছে। পরেরদিন পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে, গুলি বিনিময় করতে গিয়ে অমুকে নিহত। নিহতের পাশে পাওয়া গিয়েছে একটি পিস্তল, দশটি বোমা, ষোলটি তাজা কার্তুজ ইত্যাদি ইত্যাদি। নিষিদ্ধপল্লীতে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার পর নেতার চরিত্রহননের জন্য গল্প ফাঁদা হয়েছে, এ ঘটনাও অজানা নয়। কিন্তু সহযোদ্ধাদের জানা-বোঝা আর সাধারণ মানুষের জানা-বোঝা তো এক নয়! সাধারণ মানুষের আবেগকে আন্দোলন বিরোধী করতেই তাই বার বার আন্দোলনের বিরোধীরা চরিত্রহননে নামে। আরো একবার এমনি একটা ঘটনাই ঘটবে। এবার নায়ক বা খল-নায়কের চরিত্রে থাকতে হবে আনন্দবাবুকে।

পিংকি ও প্রীতির দিকে তাকালেন আনন্দবাবু। পিংকি চিন্তা-শূন্যভাবে ওর সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের কী সব বলে চলেছে, দু'হাত মাথায় তুলেই, সম্ভবত ওদের ভয় দূর করতে চাইছে। বেচারা জানেও না, একটু পরেই ওকে ভেঙে পড়তে হবে দুঃখে, অপমানে। প্রীতি যে কিছুটা ভয় ও অস্বস্তিতে আছে, তা ওর চোখে-মুখে অতিমাত্রায় প্রকট। এমন অপমান মাথায় নিয়ে প্রীতি কী করে বাঁচবে কে জানে? প্রীতিকে পিংকি কতটা সামলাতে পারবে কে জানে? পিংকি এখনও এত ছোট, সংসারে লড়ে বাঁচবে কী করে, কে জানে। কত আশা ছিল, পিংকি দ্রুত তৈরি হয়ে উঠবে। সহযোদ্ধা হিসেবে আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু...

চিন্তায় ছেদ পড়ল একটি পুলিশের আহ্বানে। আনন্দবাবু ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলেন।

আনন্দবাবু যখন ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর সমস্ত চেতনা জুড়ে পরম বিস্ময়। সমস্ত পোশাক ও শরীর তন্নতন্ন করে তল্লাসী করেও ড্রাগের দর্শন মেলেনি। তবে কি কেউ নেহাৎ অস্বস্তিতে ফেলার জন্যেই পুলিশকে একটা ফালতু খবর দিয়েছিল?

উত্তর মিলল একটু পরেই, খবরটা মোটেই ফালতু ছিল না। বিজয় রামারাওয়ের পাঞ্জাবির পকেটেই পাওয়া গেছে অন্তত দশ গ্রাম হেরোইন।

পুলিশ যখন রামারাওকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে তুলেছিলেন, তখন রামারাও দু'হাতের হাতকড়া নিজের কপাল ঠুকতে ঠুকতে পাগলের মত কী যেন বলেছিলেন আর আর্তনাদ করেছিলেন। রামারাওয়ের কর্ম চারীরা সকলেই কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। পিংকি রেস্তোরাঁর ইউনিফর্ম পরা কর্মচারিদের মুখগুলোতে চোখ বোলাল। উত্তেজিত, অসহায়, বিহ্বল, শোকার্ত, নানা ধরনের অভিব্যক্ত ওঁদের মুখে।

রামারাও কি নিজের অপকর্মের জন্য অনুশোচনা করছেন? দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা জানা না থাকায় পিংকি ওঁর কথাগুলো বুঝতে পারছিল না। তবু মনে হলো, রামারাও কৃতকর্মের অনুশোচনা করছে না, দোষ দিচ্ছে ভাগ্যকে। হঠাৎ একটি সুদর্শন তরুণকে দেখা গেল দৌড়ে রামারাওয়ের দিকে এগোতে। পুলিশের কাছ থেকে বাধা পেতে পাগলের মত পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি বাধিয়ে দিল। তরুণটির ডান হাতের আঙুলগুলোয় ব্যাণ্ডেজ জড়ান, নতুন ব্যাণ্ডেজ। পিংকি চোখ দুটো উত্তেজনায় মুহূর্তে দপ্ দপ্ করে উঠল। ঠিক সেই সময় পিংকির কানের কাছে ফিসফিস করে কেউ বলল, "রামারাওয়ের ছেলে বাবু!" পিংকি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। পদ্মিনী কথা বলছে।

পিংকি একটু এগিয়ে গিয়ে বাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চাইল। বাবু পিংকিকে আমল না দিয়ে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতে চাইল। পিংকি বাবুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "কাল বোধহয় একটু জোরেই কামড়ে দিয়েছিলাম, তাই না?"

বাবু রাগে দাঁতে দাঁত চেপে পিংকির দিকে এমন ভাবে তাকল যেন দৃষ্টিতেই ভস্ম করে দিতে চায়। এক সময় হিস্ হিস্ করে অস্পষ্ট

উচ্চারণে বলল, "কী বলতে চাইছ তুমি?"

পিংকি শিশুর সারল্য ছড়িয়ে হাসল বলল, "না তেমন কিছু বলতে চাই না যাতে তুমি আমাকে হত্যার অপরাধে সারাজীবন জেল খেটে মর। তোমার ব্যাণ্ডেজ সরালে যে আমারই দাঁতের দাগ পাওয়া যাবে তা তুমি আর আমি দু'জনে ভাল করেই জানি।"

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতই ভয়ে কুঁচকে গেল বাবু। ছিট্‌কে চলে গেল রেস্তর"ার দিকে। সাইরেন বাজিয়ে বেরিয়ে গেল পুলিশ ভ্যান ও তার পিছু পিছু আরও চারটে পুলিশের গাড়ি। জনসমুদ্রে এক সময় ডুবে গেল গাড়িগুলো।

পিংকি শিস দিয়ে গেয়ে উঠলো 'ম্যায় আজাদ হুঁ' সিনেমার গানের সুর। ওর বেশ হালকা লাগছে, ঝরঝরে লাগছে। একবারের জন্যেও ওর মনে হলো না, সবার অজ্ঞাতে বাবার পকেট থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে প্যাকেটের মালিক রামারাওয়ের পকেটে ফেলে দিয়ে কোনও অপরাধ করেছে। পিংকি অনুমান করে নিয়েছিল রামারাও নিশ্চয়ও কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে বাবার গায়ে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করেছে। কী সেই উদ্দেশ্য? রামারাও জাদুকর, হাতসাফাই ভালই জানে। ও কী পড়ে যাওয়ার অভিনয়ের সুযোগে বাবার পকেট থেকে বের করে নিতে চেয়েছে, অথবা ঢোকাতে চেয়েছে? রামারাও ধনী, নিশ্চয়ই পকেট মারার চেষ্টা করবে না। তবে কী কিছু ঢোকাতে চাইছিল? ঢুকিয়ে লাভ? ঢুকিয়ে লাভ হতে পারে বৈকি। পকেটে একটা ছোট্ট ড্রাগের প্যাকেট ঢোকাতে পারলে এবং পুলিশকে খবরটা দিতে পারলে যুক্তিবাদী আন্দোলনের শত্রুদের বা অবতারদের এজেন্টদের লাভ তো বিশাল। বাবার পকেটে প্যাকেটটা পেতেই রামারাওয়ের ষড়যন্ত্রের রূপরেখাটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। অনুমান করেছিল, প্যাকেটে ড্রাগই আছে। রামারাওয়ের পরবর্তী পদক্ষেপই হবে বাবাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশকে খবর দেওয়া। খবর পাঠানোর সংকেতও হয়তো উনি সময়মত পাঠিয়েছেন। মাদ্রাজ রেস্তোর"া থেকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে ফোন গেছে। আজ পিংকি যা জেনেছে এবং ঘটিয়েছে তা কোনও দিনই কারো

কাছেই প্রকাশ করবে না বলে মনে মনে সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

"কী গো মিস্টার হিরো, আমাদের এখানকার পুলিশরা কত কর্মদক্ষ দেখলে তো ?" পদ্মিনীর কথায় চিন্তার রেশ কাটল পিংকির।

"হ্যাঁ, তা যা বলেছ।" বলেই পিংকি আবার মনের আনন্দে শিস দেওয়া শুরু করল।

১৯ ফেব্রুয়ারির সন্ধে ৭টা।

ভেঙ্কটের ফ্ল্যাটের মাঝারি হল ঘরটায় ছোট-বড়, মহিলা-পুরুষে ঠাসা ভিড়। সকলেরই দৃষ্টি এই মুহূর্তে পিংকির দিকে। পিংকির পরনে একটা সাদা ট্রাউজার, খালি গা। কপালে, বুকে, পেটে, পিঠে সর্বত্রই ফোঁড়া রয়েছে স্টেনলেস স্টিলের শলাকা। এখনও শলাকা ফোঁড়া হচ্ছে বাহুতে ফুঁড়ে দিচ্ছিলেন আনন্দবাবু। চামড়ার উপরের পাতলা অংশে তীক্ষ্ণ শলাকাটা কাঁথা সেলাইয়ের মত ঢুকিয়ে বের করে আনছেন। বোঝাচ্ছিলেন, "লক্ষ্য করলেন তো, প্রতিটি শলাকাই চামড়ার পতলা অংশ ভেদ করে মাংসপেশীতে কখনই আঘাত করছে না, ফলে না রক্তপাত, না সহ্যাতীত ব্যথা! জিভে যে স্টিলের শলাকা ফোঁড়া হচ্ছে সেটা এবার দেখাচ্ছি।"

পিংকির জিভে একটা ত্রিশূল গেঁথে দিলেন আনন্দবাবু, হলে ছড়িয়ে পড়লো একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের মিশ্রিত ধ্বনি। পিংকির জিভে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে রয়েছে সরু একটা ত্রিশূল। পিংকি এবার ত্রিশূলটা একটু ঘোরাতেই আর এক চমকের মুখোমুখি হলেন সকলে। ত্রিশূলার মাঝখানটা ইউ-এর আকারে তৈরি। ইউটা জিভের উপরের মাঝামাঝি থেকে ঘুরে নিচের মাঝামাঝি জায়গা পর্যন্ত গিয়েছে জিভের উপরে ও নিচে সোজাসুজি উপরে উঠে গেছে ও নিচে নেমে গেছে। ইউটা ভেতরের দিকে ঠেলে দিলে দর্শকদের দৃষ্টি যা ধরা পড়ে, তা হলো ত্রিশূলটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে চলে গেছে।

এবার ভেঙ্কট একটা ট্রেতে করে নিয়ে এলেন চারটে বড় বড় রঙিন

মোমবাতি। বাতিগুলো ট্রে থেকে তুলে এক এক করে ডাইনিং টেবিলের ওপর বসিয়ে দিল পিংকি। তারপর মোমবাতিগুলোর সামনে দুটো হাত নাড়তে নাড়তে অং—বং—চং কী সব মন্ত্র পড়তে লাগল। তারপর একসময় সকলকে অবাক করে দিয়ে মোমবাতিগুলো এক এক করে জ্বলে উঠল আপনা থেকেই!

বনি আনন্দে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "মুরুগান পিংকির ওপর অপার কৃপা করেছেন।"

পিংকি টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল, "না, কৃষ্ণ আয়ারের অলৌকিক ক্ষমতায় বা মুরুগানের কৃপায় নয়, বিজ্ঞানের কৃপাতেই মোমবাতিগুলি জ্বালিয়েছি। একটা পাত্রে মিহি গুঁড়ো করে ফস্‌ফরাস ও কার্বন ডাই-সালফাইড গুলিয়ে ওই রসায়নে মোমবাতি গুলোর পলতে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। পাত্র থেকে তুলে মোমবাতি গুলো ডাইনিং টেবিলে সাজিয়েছি, ডাই-সালফাইড সহজে উপে যায়। এই মোমবাতিগুলোর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ফলে পলতেগুলোতে রয়ে গেছে শুধুই ফসফরাস। ফসফরাস সাধারণ উত্তাপেই হাওয়ার সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। এ-ক্ষেত্রেই তাই-ই হয়েছে, ফসফরাস জ্বলে উঠেছে, জ্বলে উঠেছে মোমবাতি।"

ঠিক এমনি সময় ঘরের আলোগুলো হঠাৎ চলে গেল। এখানেও লোডশেডিং? প্রশ্নটা পিংকি, প্রীতি ও আনন্দবাবু তিনজনেরই মাথায়।

চারটে মোম জ্বলছে। একঘর মানুষের আশাকে উদ্দীপ্ত করে জ্বলছে চারটি অলৌকিক মোমবাতি।

ভেঙ্কট ঘোষণা করলেন,"১ মার্চ আমরা কুয়ালালামপুর র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোশিয়েশন গড়বো, অফিসিয়ালি, ওই দিন বিকেলে অনুষ্ঠান করবো প্রেস ক্লাবে। শরীরে ত্রিশূল ফুঁড়ে ও বিনা আগুনে মোমবাতি জ্বেলে শুরু করব আমাদের আন্দোলনের জয়যাত্রা। আপনারা কী বলেন?"

সকলেই তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সমর্থন জানালেন ভেঙ্কটের ঘোষণাকে।



টেলিপ্যাথি-মানবী ও পিংকি

২৩ ডিসেম্বর ১৯৯০।

এ একেবারে যুদ্ধ ঘোষণা। আনন্দবাবুর বিরুদ্ধে, যুক্তিবাদী সমিতির বিরুদ্ধে যে ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো সেটা 'মশা মারতে কামান দাগা'র একটা নির্ভেজাল উদাহরণ ছাড়া কিছু নয়।

আনন্দবাবুকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানান হলো খোদ কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স ডেকে। সাংবাদিক সম্মেলনটি ডেকেছিলেন বাংলাভাষায় প্রকাশিত সোভিয়েত পত্রিকা 'যুব-সমীক্ষা'। সাংবাদিক সম্মেলনে আনন্দবাবুর বিরোধিতা করতে হাজির ছিলেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির আকাদেমিশিয়ান বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ওয়াই কোভজারভ। হাজির ছিলেন রাশিয়ার আশ্চর্য মানবী মাদাম কুলাগিনা। ডঃ কোভজারভই যুদ্ধের সেনাপতিত্বের ভার নিয়ে একের পর এক মিসাইল ছুঁড়েছেন আনন্দবাবু ও যুক্তিবাদী সমিতিকে লক্ষ্য করে। মোমের পুতুল মাদাম কুলাগিনাও কম কামানের গোলা নিক্ষেপ করেননি আনন্দবাবুকে লক্ষ্য করে!

ওঁরা যে সাংবাদিক সম্মেলনটি ভালই জমিয়েছিলেন, সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না, প্রভাতী পত্রিকাগুলোয় চোখ বোলালে। 'বর্তমান'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই চার কলম জুড়ে খবরটা প্রকাশিত হয়েছে। তিন কলম জুড়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ কোভজারভ ও মাদম কুলাগিনার ছবি। হেড লাইন—আশ্চর্য মানবী মাদাম কুলাগিনা ভারতে : চ্যালেঞ্জের মুখে যুক্তিবাদী আনন্দ ঘোষ।

আনন্দবাজারের প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরটি ছাপা হয়েছে ছবি সহ। হেড-লাইন—অপপ্রচারের জবাব দিতে কুলাগিনাকে ভারতে আনলাম ডঃ কোভজারভ।

'আজকাল' প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরটি ছেপেছে। ছেপেছে মাদাম কুলাগিনা ও ডঃ কোভজারভের ছবি। হেড-লাইন—যুক্তিবাদী সমিতি

রুশ সাইন্স আকাদেমির চ্যালেঞ্জের মুখে।

টেবিলে গাদা খবরের কাগজ ছড়িয়ে বসেছেন আনন্দবাবু। পরনে বম্বে ডাইংয়ের প্রিন্টেড লুঙ্গি ও হাফ-হাতার সুতীর পাঞ্জাবী। এ-ঘরটা আনন্দবাবুর পড়াশুনা ও শোয়ার ঘর। ঘরটা ছোট, দেওয়াল বলে কিছুই নেই। চারপাশেই র‍্যাক, আর শুধু বই-বই-বই। আছে একটা ফোলডিং টেবিল, লেখাপত্তর হয়ে গেলে বন্ধ করে দেন। দুটো চেয়ার, একটা আরাম কেদারা, একটা ছোট্ট ফিলিভিশন টি. ভি। প্রয়োজনে প্রীতির ঘরের থেকে ভি. সি. আরটা নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় ক্যাসেট-ট্যাসেট দেখেনে। প্রীতির ঘরের রঙিন টি. ভি. টিকে যাতে সর্বক্ষণ আনন্দবাবু দখল না করে রাখেন, তাই গত বছর আনন্দবাবুর জন্মদিনে প্রীতি ফিলিভিশন টি. ভি.টা এনে দিয়েছেন।

এখন আটটা চল্লিশ, প্রীতি বুঝে নিয়েছেন আজ আর আনন্দ অফিস যাচ্ছেন না। গেলে এতক্ষণে স্নান সেরে খেতে বসে যেতেন। এই ধাক্কা সামাল দিতে আরো কয়েকটা দিন যে অফিস যাবেন না আনন্দ, এ বিষয়েও নিশ্চিন্ত প্রীতি।

আনন্দবাবুর টেবিলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে প্রীতি বললেন, "তুমি যখন বাজারে গিয়েছিলে তখন সুমিত্রা আর নীতা ফোন করেছিল। দু'জনেই খোঁচা মেরে কথা বলল, "কিরে আজকের কাগজ পড়েছিস ? আনন্দকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। আনন্দ তো এখন ভি.আই, পি। শত হলেও চ্যালেঞ্জার যখন রুশ সাইন্স আকদেমি, আনন্দ চ্যালেঞ্জ ফেস করবে তো ? এই মানসিক চাপে ওর শরীর না খারাপ হয়ে পড়ে দেখিস।"

আনন্দবাবু প্রীতির মুখের দিকে একবার তাকালেন। মুখটা থম্‌থম্ করছে, ঝড়ের পূর্বাভাস। চায়ের কাপে একটা দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললেন, "সত্যিই তোমার জবাব নেই। ঠিক এই সময় এক কাপ চায়ের কথাই মনে মনে ভাবছিলাম।"

"থাক্ থাক্, তোষামোদ করে আমাকে আর ভোলাতে হবে না।

তুমি যা আরম্ভ করেছ না, বয়সটাই বেড়েছে, বুদ্ধি বাড়েনি। সামান্যতম নিজের ওজন বোঝো না। আহাম্মকের মত কুলাগিনাকে খোঁচাতে গিয়েছিলে কেন? নাম হবে বলে? এইবার বদনামের চোটে তো টেঁকা দায় হবে। তোমার জন্য টিটকিরি শুনতে হবে দুনিয়ার লোকের কাছে। একেই বলে, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হলো তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে।' তোমার জন্য শেষ পর্যন্ত আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে দেখছি।"

প্রীতির কথাগুলোকে বেমালুম হজম করে আনন্দবাবু একগাল হেসে বললেন, "তোমার না হাই-প্রেসার? একদম রাগারাগি করবে না, শরীর খারাপ হবে। হঠাৎ তোমার কোন কিছু একটা হয়ে গেলে হ্যাঁপা কম। তুমি নয় মরে বাঁচলে, কিন্তু আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবেছ? এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে তোমার দেহটি হাসপাতালে দান করার ব্যবস্থা করতে।"

"তুমি যা আরম্ভ করছ তাতে একদিন সত্যিই স্ট্রোক বা সেরিব্রাস অ্যাটাকেই মারা যাবো।"

কথাগুলি আনন্দবাবুর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে দুম্-দাম্ করে পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন প্রীতি।

বাজার থেকে ফেরার পথে পাশের বাড়ির সুনীলবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি একগাল হেসে বললেন, "কী আনন্দবাবু, আপনি তো রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে গেলেন মশাই। আপনি মশাই আমাদের পাড়ার ইজ্জত, আপনাকে জিততেই হবে। আপনি মাইক টাইসনকে বক্সিং-এ চ্যালেঞ্জ জানালেও আপনার সাপোর্টার আমি, রুশ সাইন্স আকাদেমিকে সাইন্স নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানালেও আপনার সাপোর্টার আমি। সোদ্দা কথায় আমি আপনার ব্লাইণ্ড সাপোর্টার, তার জন্যে লোকে আমাকে পাগলই বলুম, আর ছাগলই বলুক।"

সুনীলবাবু একটি পরচর্চাপ্রিয় ব্যক্তি! মধ্যবয়স্ক নাদুস-নুদুস

সুনীলবাবু কথাগুলো শেষ করে ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসলেন।

সুনীলবাবুর অপমানগুলো গায়ে না মেখে আনন্দবাবু হাসলেন, "আপনার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। কত ছাগল-পাগল কত কিছু বলবে, বলতে দিন দু'দিনর জন্য। পরশু প্রেস কনফারেন্সের পর ওদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে।"

সুনীলবাবুর মতও আর অনেকই যে আনন্দবাবু এমন একটা বিশাল প্যাঁচে পড়ায় আনন্দে মনে মনে ডিগবাজি খাবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী?

গত দেড় ঘণ্টায় জনাসাতেক সাংবাদিক ফোন করেছিলেন। হরেক রকম তাঁদের প্রশ্ন, "মাদাম কুলাগিনার অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ নিতে আপনি ২৫ ডিসেম্বর বিকেলে প্রেস ক্লাবে হাজির হচ্ছেন কি?" "আপনি কী নিশ্চিত মাদাম কুলাগিনার অলৌকিক ক্ষমতা নেই?" "কুলাগিনার লৌকিক কৌশল রুশ সাইন্স আকাদেমি ধরতে পারেনি, কিন্তু আপনি ধরতে পেরেছেন—এমনটা ভাবার কারণ কী?" "আপনি কী মাদাম কুলাগিনার মত ঘটনাগুলো ঘটিয়ে দেখাতে পারেন?" "আপনার কী মনে হয় না রুশ সাইন্স আকাদেমি একজন আকাদেমিশিয়ান ও মাদাম কুলাগিনাকে কলকাতায় পাঠিয়ে আপনাকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্মান দেখিয়েছেন?" "আপনি এমন অদ্ভূত আচরণ করলেন কেন? স্রেফ স্টাণ্ট দিতে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আনন্দবাবু শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকদের প্রশ্নবান এড়াতে ফোনের কানেকশনটাই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন।

আসলে এটা মাদাম কুলাগিনা বা সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ না বলে পাল্টা চ্যালেঞ্জ বললেই ঠিক বলা হতো। কারণ খোঁচাটা প্রথম দিয়েছিলেন আনন্দবাবুই। তবে সেই সামান্য খোঁচাটাই যে এমন অসামান্য গুরুত্ব পাবে, এটা ছিল আনন্দবাবুর কল্পনার বাইরে।

'যুব সমীক্ষা' পত্রিকায় প্রথম মাদাম কুলাগিনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে পারেন আনন্দবাবু। 'যুব সমীক্ষা' সোভিয়েত

দূতাবাসের বার্তা বিভাগ থেকে প্রকাশিত বাংলা মাসিক পত্রিকা। প্রবন্ধটা পড়েই ঝটপট একটা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যুব সমীক্ষা দপ্তরে। চিঠির একটি প্রতিলিপি পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমিকে।

ফাইল বের করে চিঠির প্রতিলিপিতে একবার চোখ বোলালেন আনন্দবাবু।

১৬. ১০. ৮৯.

প্রিয় সম্পাদক
'যুব সমীক্ষা'
কলকাতা-১৬

প্রিয় সাথী,

'যুব সমীক্ষা' সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ সংখ্যায় 'টেলিকাইনেসিস' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে জানান হয়েছে নিনেল কুলাগিনার আশ্চর্য টেলিপ্যাথি ক্ষমতার কথা।

প্রবন্ধ পাঠে আরো জানলাম, ১৯৭৮ সালে জাপানী টেলিভিশনের অনুরোধে সোভিয়েত দূরদর্শন কুলাগিনার ওপর একটি ফিল্ম তুলে দেয়।

প্রবন্ধটি পড়ে এও জেনেছি—সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির পক্ষে আকাদেমিশিয়ান ওয়াই কোভজারভ মাদাম কুলাগিনার টেলিপ্যাথি ক্ষমতার পরীক্ষা নিয়ে জানিয়েছেন—নিরপেক্ষ স্থানে পরীক্ষা নেওয়া একান্তই প্রয়োজনীয় এই কথা মনে রেখেই তিনি এক আকাদেমি-শিয়ান বিজ্ঞানীর বাড়িতে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। মাদাম কুলাগিনার চোখ বেঁধে দেওয়া হয় রুমাল দিয়ে। কুলাগিনাকে বসিয়ে দেওয়া হয় একটি চেয়ারে। কুলাগিনার মাথার পিছনের দিকে বেশ কিছুটা দূরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয় তিনটি রঙের তিনটি তাসের আকারের কার্ড। প্রত্যেকটি

কার্ডে লেখা ছিল একটি করে সংখ্যা। কার্ডের কাছে ছিলেন কুলাগিনার এক সহযোগী বরিস। তিনি কার্ডগুলোতে চোখ বোলাতেই কুলাগিনা তাঁর প্রেরিত চিন্তা তরঙ্গ ধরে নিয়ে প্রতিটি কার্ডের রঙ ও সংখ্যা বলে দিলেন ঠিক ঠিক। ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং যথেষ্ট রহস্যাবৃত। তবে এই ক্ষমতাকেই বলা হয় টেলিপ্যাথি। এমন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কুলাগিনার পক্ষে কোনও কৌশল গ্রহণ করা নিশ্চিত ভাবেই সম্ভব ছিল না। কারণ পরীক্ষা কক্ষে কুলাগিনা ও তাঁর একমাত্র সহযোগী ছাড়া আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞান আকাদেমির আকাদেমিশিয়ান। কক্ষটিতে কোনও যান্ত্রিক কৌশল আগে থেকেই প্রয়োগের ব্যবস্থা করে রাখা কুলাগিনার পক্ষে ছিল অসম্ভব।

অপনার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটি আমাকে ও আমাদের সমিতিকে আকৃষ্ট করেছে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোনও ব্যক্তির কথা শুনলে আমি র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক হিসেবে প্রকৃত সত্য জানতে সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। এই ধরনের সত্যকে জানার প্রচেষ্টাকে 'যুব সমীক্ষা' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এবং 'সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি' স্বাগত জানাবেন বলে আশা রাখি।

কুলাগিনার টেলিপ্যাথি ক্ষমতার বিষয়ে আমার নেতৃত্বে আমাদের সমিতির তিনজনের দল পরীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক।

প্রসঙ্গত জানাই, আজ পর্যন্ত বহু অলৌকিক ক্ষমতার দাবীদারদের মুখোমুখি হয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখেছি, তাঁদের দাবীগুলো নিতান্তই অসাড়। তাঁরা প্রত্যেকেই লৌকিক কৌশলের সাহায্যেই ঘটনাগুলো ঘটাতেন। পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুনিশ্চিতভাবে আশা রাখি কুলাগিনা রহস্যও ভেদ করতে সক্ষম হবো। অর্থাৎ স্পষ্টতই বলতে

চাই কুলাগিনার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। তিনি কিছু লৌকিক কৌশলেরই সাহায্য নিয়ে ছিলেন। ঐ কৌশল বিষয়ে আকাদেমিশিয়ানদের সঠিক ধরণা না থাকায় কৌশলটি ধরতে পারেন নি। কিন্তু অংহবোধে দ্বারা পরিচালিত হয়ে ধরে নিয়েছেন—আমাদের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা যখন ঘটনাটির পিছনে কোনও কারণ খুঁজে পাইনি, তখন কোনও কারণই নেই। অর্থাৎ অলৌকিক উপায়েই ঘটনাটা ঘটান হয়েছে। তাঁরা একবারও ভাবলেন না, তাঁদের অজ্ঞাত কোনও কারণ এর পিছনে থাকতে পারে। এমন নিশ্চিয়তাবোধ এসেছে আকাদেমিশিয়ানদের বিশ্ব-খ্যাতির অহংবোধ থেকে।

সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি মাদাম কুলাগিনাকে টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, আশা রাখি সেই বিভ্রান্তি দূর করে সত্যকে প্রকাশ করতে আপনার পত্রিকা ও সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি আমার ও আমাদের সমিতির সহযোগিতা সাদরে গ্রহণ করবেন এবং কুলাগিনাকে পরীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবেন যার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে আমাদের যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

আপনাদের তরফ থেকে সহযোগিতা না পেলে অবশ্যই ধরে নিতে বাধ্য হবো—আপনারা সত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক এবং একই সঙ্গে আপনারা অন্ধবিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কালো দিনগুলো ফিরিয়ে আনন্তে সচেষ্ট।

দ্রুত উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম। প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

আনন্দ ঘোষ

সম্পাদক

র‍্যাসানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

অফ ইণ্ডিয়া

চিঠির উত্তর এসেছিল স্রেফ তিন লাইনে,—"আমরা আপনার ১৬.১০.৮৯ তারিখের চিঠিটি পয়েছি এবং আমাদের নয়া দিল্লির অফিসে দিয়েছি। ধন্যবাদসহ···"

তারপর দীর্ঘ নিরবতা, ফলে বেশ কিছু লেখায় ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে খুব সমীক্ষা ও সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির আশ্চর্য নীরবতা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন আনন্দবাবু।

গতকাল বাড়ি ফিরে জানতে পারেন যুব সমীক্ষার তরফ থেকে একটা খাম দিয়ে গেছেন এক ভদ্রলোক। প্রাপ্তির স্বীকৃতি হিসেবে একটা খাতায় সই করতে হয়েছে পিংকিকে।

খামে ছিল এক দীর্ঘ চিঠি, যার সার বস্তুঃ আগামী ২৫ ডিসেম্বর বিকেল তিনটেয় কলকাতা প্রেস ক্লাবে হাজির করা হচ্ছে মাদাম কুলাগিনাকে। উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট রুশ বিজ্ঞানী ওয়াই কোভজারভ এবং দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক। সাংবাদিকদের সামনে মাদাম কুলাগিনা তাঁর টেলিপ্যাথি ক্ষমতার পরীক্ষা দেবেন। ইতিপূর্বে আপনি মাদাম কুলাগিনার ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন। আপনি জানিয়েছিলেন, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির ঘোষণা ছিল ভুল, আকাদেমিশিয়ানরা তাঁদের চূড়ান্ত অজ্ঞতাকেই বিজ্ঞতা বলে ভুল করেছিলেন। আপনার ও আপনার সমিতির বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের সুযোগ দিতে আপনাকে এবং আপনাদের সমিতির আরো তিন জনকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির থাকতে অনুরোধ করছি। সে-দিন মাদাম কুলাগিনা আবারও তাঁর টেলিপ্যাথি ক্ষমতা প্রমাণ করবেন।

গতকাল থেকে এখনও পর্যন্ত চিঠিটায় বেশ কয়েকবার চোখ বুলিয়েছেন আনন্দবাবু। চিঠিতে তো সত্য জানার আগ্রহ নেই? আছে নিজেদের জানাকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আনন্দবাবু—এ সবই অহংবোধের ফল। এ-দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আনন্দবাবুর কটাক্ষগুলো ওদের অহংবোধকে আঘাত করেছে। আনন্দবাবুর বক্তব্য ভারতের কিছু সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করেছে

ধরে নিয়ে সেই প্রভাব থেকে মুক্ত করতে ভারতবর্ষে আনন্দবাবুরা মুখোমুখি হওয়াটাই সেরা উপায় হিসেবে ধরে নিয়েছেন রুশ বিজ্ঞান আকাদেমি। মন্দ নয়, এ যেন পর্বতই এলো মুহম্মদের কাছে।

আনন্দবাবু কয়েকটা ফোন করলেন। পিংকি ইতিমধ্যে বার কয়েক বাবার কাছে ঘুরঘুর করলো। পিংকির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন বাবা। কিন্তু এই মুহূর্তে চিন্তিত বাবাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে মন চাইছিল না। বাবার দ্বন্দ্বটা পিংকি অনুভব করতে পারছিল, সময়টা বড় কম। একদম সময় না দিয়ে আচমকা এসে পড়েছে বিশাল চ্যালেঞ্জ। স্কুল বন্ধ, বড় দিনের ছুটি চলছে। চব্বিশ তারিখ রাতে পাপু, ডাব্বু আর সুকান্তের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে যাওয়ার কথা। বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেটাই চলে গেছে। কাল চিঠিটা পিংকিই রিসিভ করেছিল। প্রেরক 'যুব সমীক্ষা' দেখে কৌতূহল মেটাতে খুব সাবধানে খামের মুখ খুলেছিল। পড়ে আবার যথারিতী আঠা সেঁটে মুখটা আটকেও দিয়েছিল। তারপর থেকেই ভেতরে ভেতরে খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে। আশা করছে বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পঁচিশ তারিখ বাবার সঙ্গী হবে। সন্দেহ অবশ্য একটা আছে ; বাবা যদি ছোট বলে পাত্তা না দিয়ে সমিতির জাদুকর এবং বিজ্ঞানী সভ্যদের নিয়ে যান। বাবা এখন যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি পার্থ জ্যেঠু সেটা বুঝতে পেরেছে।

"...আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছি।"

ফোনটা নামিয়ে রেখে দেড় মিনিটের মধ্যে লুঙ্গি ছেড়ে শুধু একটা প্যান্ট পরে নিলেন, গলিয়ে নিলেন চপ্পল। মোটর বাইকটা বের করতে করতে বললেন, "প্রীতি একটু বেড়াচ্ছি পার্থদার বাড়ি যাচ্ছি।"

প্রীতি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "কখন ফিরবে? তোমার জন্যে তিনটে পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকতে পারব না। আর কোথায় কোথায় যাবে বলে যাও।"

"না রে বাবা, শুধু পার্থদার বাড়িতেই যাবে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব।"

"তোমার ঘণ্টাখানেক মানে তো..."

"আরে না, না, মথ্যে রাগ কর কেন। পার্থদার অফিস আছে না।"

"মা, আমিও একটু ঘুরে আসছি বাবার সঙ্গে।"

"বাঃ, ছেলেটাকেও নাচিয়েছো?"

প্রীতির কথা শুনে কাঁধ ঝাঁকালেন আনন্দবাবু, "আমি আবার কখন নাচালাম। আসলে তোমাদের নাচ-গানের পরিবারের রক্ত পেয়েছে তো, তাই কথায় কথায় যখন তখন নেচে ওঠে।"

আনন্দবাবু বাইকে স্টার্ট দিলেন। পিংকি মা'র গালে একটা চুমু দিয়ে বললো, "ছিঃ, রাগ করে না, প্রেসার বেড়ে যাবে।" তারপরই বসলো আনন্দবাবুর পেছনে। ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল লাল রঙের মোটর বাইকটা।

"বাপ-ব্যাটা ছুটোইতোই হয়েছে আচ্ছা উড়নচণ্ডি। দেশোদ্ধার করছে। দাঁড়াও, আমিও এবার থেকে উড়ে উড়ে বেড়াব।"

প্রীতি কথাগুলো বলতে বলতে চললেন রান্নাঘরের দিকে।

লক্ষ্মী সোরেন চকচকে চেহারার কুচকুচে কাল লক্ষ্মী সোরেন প্রীতির হেলপিং হ্যাণ্ড ফিক্ করে হেসে চললো মামীর পিছু পিছু। ও জানে এবার মামী গজগজ করতে করতে পুডিং বানাবেন। মামা বাড়িতে আছেন এবং পুডিং ভালোবাসেন তো, তাই।

"এইট্টি ফাইভে মস্কোর বলশই থিয়েটার হলে মাদাম কুলাগিনাকে দেখি। যা দেখেছি, তা ভোলবার নয়। অসাধারণ। কুলাগিনার চোখ ছিল বাঁধা। দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কুলাগিনার এক সহকারি দর্শকদের মধ্যে নেমে এলেন। হাতে মাইক্রোফোনের মাউথপিস্। এক একজন দর্শকের সামনে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন নানা ধরনের প্রশ্ন-এর কোটের রঙ কী? এ কী রঙের ট্রাউজার পরেছে? এর পকেটে কী? ইত্যাদি ইত্যাদি। কুলাগিনা প্রত্যেকটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে দর্শকদের একবার সম্মোহিত করে রেখে দিয়েছিলেন। আমি এক সময় পকেটে থেকে পাসপোর্ট

বের করে কুলাগিনার সহকারীকে দেখিয়ে বলেছিলাম—এটা কী বলতে বলুন। কুলাগিনা তাঁর সহকারীর পাঠান চিন্তা ধরে বলে দিলেন—পাসপোর্ট।"

সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সল্টলেকের বাড়ির দোতলার ড্রইংরুমে বসে অসাধারণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি মন্থন করছিলেন।

পিংকি কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শুনছিল আর ভাবছিল, সুভাষচন্দ্রের জীবনী নিয়ে কোনও ফিল্ম বা সিরিয়াল করতে নাম ভূমিকায় ইজি পার্থ জ্যেঠুকে নামান যায়।

"মাদাম কুলাগিনা যে সঠিক উত্তর দিচ্ছেন এটা আপনি কী করে বুঝতে পারছিলেন? আপনি কী রুশ ভাষা জানেন?" আনন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"রুশ সাংবাদিক মিস্টার এরিখ আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ওদের কথোপকথনগুলো বলে যাচ্ছিলেন।"

"কিন্তু মিস্টার এরিখ যদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করে থাকেন?"

"প্রতিটি উত্তরের পর দর্শকরা যে বিপুলভাবে কুলাগিনাকে অভিনন্দিত করছিলেন, তা শুধু সফল হলেই পাওয়া সম্ভব। তুমি তো জান, এ-দেশের অনেক ফেমাস ম্যাজিসিয়ানদের সঙ্গেই আমার একটা ভাল সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁদের নানা ধরনের ম্যাজিক দেখেছি। কুলাগিনার ওই টেলিপ্যাথি ক্ষমতা যদি তোমার ধারণা মত ম্যাজিক ট্রকই হয়, তবে বলতেই হবে, আমার দেখা সেরা ম্যাজিসিয়ান মাদাম কুলাগিনা।"

"জ্যেঠু, এক্স-রে আইয়ের খেলা তো দেখছ। তার সঙ্গে কুলাগিনার টেলিপ্যাথির কোনও রকমের সামান্যতম মিল কী চোখে পড়েছে?" কিশোর জাদুকর পিংকি জবাবটা শুনে ওর ভাবনাকে পরিচালিত করতে চাইছিল।

"আরে না, না, টেলিপ্যাথির সঙ্গে এক্স-রে আইয়ের কোন দিক থেকেই কোনও রকমের মিল নেই। আমার তো এখন উঠতে হবে,

গাড়ি আসার সময় হয়ে এলো। তোমাদের বরং কুলাগিনার ওপর তোলা একটা ভি. ডি. ও. ক্যাসেট দিচ্ছি। কিন্তু দুটো সর্ত আছে, ক্যাসেটটা পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত রাখতে পার। কারো রিকেয়েস্টেই ক্যাসেট হাত ছাড়া করবে না।"

"সর্ত দুটিই তামিল হবে পার্থদা," আনন্দবাবু হাসলেন।

পার্থবাবু উঠে দাঁড়ালেন গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে। ক্যাসেট আছে বেড রুমে।

বত্রিশ মিনিটের ক্যাসেটা। রুদ্ধশ্বাসে দেখার মত। ভাষা কোনই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

"কী ভাবে সত্যিই সব ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছে বল তো?" প্রীতির কথার সুরে কিছুটা চিন্তা মিশে রয়েছে, আনন্দবাবুর সম্মানের চিন্তা।

"সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি।" আনন্দবাবু বললেন।

"কিন্তু এমনও তো হতে পারে, বাস্তবিকই কুলাগিনা টেলিপ্যাথির সাহায্যেই তাঁর সহকারীর চিন্তা ধরে নিতে পারছেন বলেই উত্তরগুলো ঠিক ঠিক দিতে পারছেন। প্যারাসাইকোলজিস্টরা টেলিপ্যাথির স্বপক্ষে যে সব যুক্তি হাজির করছেন, সেগুলো এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারে কী? তাঁদের মতে চিন্তার সময় মস্তিষ্ক থেকে রেডিও ওয়েভের মত চিন্তা তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে মস্তিষ্কের প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে। দূরের কোনও লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গ ধরে প্রেরকের চিন্তার হদিস পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।"

"প্যারাসইকোলজি বিজ্ঞান নয়, তাই তাদের কথাকে বিজ্ঞানের কথা বলে ধরে নিলে তো গোড়ায় গলদ হয়ে যাবে। আসলে 'সাইকোলজি' আর 'প্যারাসাইকোলজি' দুটো শব্দ এত কাছাকাছি যে ভুল হয়ে যায়। এই যেমন 'অ্যাসট্রোনমি' ও 'অ্যাসট্রোলজি' শব্দদুটোয় যথেষ্ট মিল থাকায় অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। ভাবেন অ্যাসট্রোনমি যে-হেতু বিজ্ঞান অতএব অ্যাসট্রোলজিও বুঝি বা বিজ্ঞান। প্যারাসাইকোলজিস্টরা আজ পর্যন্ত এই ধরনের কোনও চিন্তা তরঙ্গের

অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি। যেমনটি প্রমাণ করা যায় আলোক তরঙ্গ ও শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে। শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত। রেডিও ও টেলিভিশন এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে। যেহেতু চিন্তা তরঙ্গের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তাই এই অস্তিত্বহীন চিন্তা তরঙ্গ ধরা নেহাৎই কল্পনামাত্র। বিজ্ঞান স্বীকার করে শব্দ বা আলোক শক্তির মতো চিন্তা কোনও শক্তি নয়, চিন্তা মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের একটি ফল।"

আনন্দবাবু টেলিপ্যাথির বাস্তব অস্তিত্ব নিয়েই টান দিলেন।

পিংকির মাথায় যে প্রশ্নটা এলো, সেটাই হাজির করল, "তুমি বলছ টেলিপ্যাথির বাস্তব অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ মাদাম কুলাগিনা যা করছেন সেটা টেলিপ্যাথি নয়, এর পিছনে রয়েছে কিছু কৌশল। ক্যাসেট দেখে কিন্তু একবারও মনে হলো না এর পেছনে কোনও কৌশল থাকতে পারে। অতীতে আর কেউ মাদাম কুলাগিনার মতো পদ্ধতিতে টেলিপ্যাথি ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন, এমন কোনও তথ্য কি তোমার হাতে আছে? সবগুলো তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে আমরা হয়তো একটা সূত্র পেতে পারি।"

"যে সামান্য তথ্য আছে, তা কুলাগিনা রহস্যের জট ছাড়াতে খুব একটা সাহায্য করবে বলে মনে হয় না। এইটটিন ফরটি সিক্সের টুয়েলভথ্ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের বিখ্যাত জাদুকর রবেয়ার উঁদা দর্শকদের সামনে তাঁর ছেলে এমিলকে হাজির করলেন টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে। ছেলের বয়স তখন মাত্র পনের। এমিলের চোখ বাঁধা হয়েছিল ব্যাণ্ডেজ দিয়ে পুরু করে। মঞ্চে বসে এমিল। উঁদা ঘুরছেন দর্শকদের মধ্যে। দর্শকরা যার যা খুশি তুলে দিচ্ছেন উঁদার হাতে, উঁদা নাকি চিন্তা তরঙ্গ ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। আর এমিল নাকি সেই চিন্তা তরঙ্গ ধরে নিয়ে দর্শকদের হাজির করা প্রত্যেকটা জিনিসের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে সববাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবেয়ার ও এমিল তাঁদের টেলিপ্যাথির ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন

বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের বহু শহরে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘরোয়া আসরেও তাঁরা দেখিয়েছিলেন টেলিপ্যাথির ক্ষমতা।

"এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লণ্ডনের আলহামব্রা হলে টেলিপ্যাথি ক্ষমতা দেখিয়ে বিশ্ব কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন জ্যাগনিস দম্পতি। হলে বহু বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে ছিলেন 'ডেইলি মেল' পত্রিকার মালিক লর্ড নর্থক্লিফ, আর বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'রিভিউ অফ রিভিউজ'-এর সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড।

"জ্যাগনিস দম্পতির জীবন একেবারে সিনেমার গল্পের মত। জুলিয়াস জ্যাগনিস ছিলেন ডেনমার্কের লোহা ঢালাই শ্রমিক। বিয়ে করেছিলেন ডেনমার্কের একটি বিকলাঙ্গ তরুণী অ্যাগ্নিসকে। ওরা পরে জুলিয়াস ও অ্যাগ্নিস নাম দুটির পরিবর্তে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস জ্যাগনিস নামে পরিচিত হন।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, অনুষ্ঠানের পরের দিনই 'ডেইলি মেল' বিশাল গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে জ্যাগনিস দম্পতির অসাধারণ টেলিপ্যাথি ক্ষমতার কথা। মিসেস জ্যাগনিস স্টেজে চোখ বাঁধা অবস্থায় দর্শকদের হাজির করা প্রতিটি জিনিসের যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার জ্যাগনিসের পাঠান চিন্তাকে ধরে নিয়ে—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন লর্ড নর্থক্লিফ! পরবর্তীকালে প্রচার, সম্মান, অর্থ, সবই ওঁরা পেয়েছেন বিপুলভাবে। জ্যাগনিস দম্পতির টেলিপ্যাথি ক্ষমতা উঁদাদের টেলিপ্যাথি ক্ষমতার মতই রহস্যই থেকে গেছে চিরকাল।"

"হয়তো কুলাগিনার টেলিপ্যাথি ক্ষমতাও রহস্যই থেকে যাবে চিরকালের মত।"

কথাগুলো বলে প্রীতি বিশাল দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

"এই ভদ্রলোক ধুতি পরেছেন, না প্যান্ট ?"

"প্যান্ট।"

"এটা কী ?"

"কলম।"

"এটা ?"

"ঘড়ি।"

"আভি বোলো তো, কী কোম্পানীর ঘড়ি ?"

"অলউইন।"

"হিসাব সে বোলো, এই ভদ্দরলোকের হাতে কী কোম্পানীর ঘড়ি ?"

"এইচ, এম. টি।"

ময়দানে আজই এমন অযাচিতভাবে টেলিপ্যাথি দেখার সুযোগ এসে যাবে, এ ছিল পিংকির চিন্তার বাইরে। অবাক হলো। কয়েক ঘণ্টা আগে কুলাগিনার যে টেলিপ্যাথি দেখে এসেছে ভি. ডি. ও. ক্যাসেটে, এ তারই জীবন্ত রূপ। পার্থক্য সামান্য আছে! কিন্তু তা প্রধানত প্রয়োগের নয়, পরিবেশের। এখানে দর্শকরা নিতান্তই অসমজদার, বেরসিক। এমন অসাধারণ টেলিপ্যাথি দেখেও মুগ্ধ হচ্ছিল না! পিংকির মনে হলো, এদেরকেই দারুণ প্রচার ও জমকালো পরিবেশের মধ্যে হাজির করলে কুলাগিনার দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে।

এখানে যে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, সে মাটিতে একটা চাদর পেতে শুয়ে রয়েছে। কালো চাদরে শরীরটা ঢাকা বলে তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলার স্বর শুনে মনে হলো বালক বা কিশোর হবে। ছেলেটির বুকের ওপর রাখা হয়েছে একটা তামার তাবিজ। শীতের পড়ন্ত সোনালী রোদে কালো চাদরের ওপর পড়ে থাকা সোনালী তাবিজটা চক্‌চক্‌ করছে। ছেলেটির মাথার দিকে রয়েছে একটা সত্য সাঁইয়ের ছবি। ছবির পাশে একটা কাটা আলুর টুকরোতে গোঁজা রয়েছে একগুচ্ছ ধূপকাঠি। ছবির সামনে একটা মড়ার খুলি, এক জোড়া ছাগলের কান ও একটা ছাগলের লেজ।

যে লোকটি প্রশ্ন করছে তার বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের মধ্যে, গায়ের রঙ কালো। রোগা পাতলা

গায়ের শির জেগে থাকা চেহারা। কিন্তু চলাফেরা ও কথা-বার্তায় দারুণ চট্‌পটে। পরনে টেরিকটনের ময়লা রঙিন শার্ট ও ডোরাকাটা লুঙ্গি। সম্ভবত হিন্দীভাষী, কিন্তু বাংলাটা ভালই বলে। সম্ভবত দীর্ঘদিন ধরে বাংলার অধিবাসী।

পিংকি লোকটিকে আঙুলের ইশারায় ডেকে বলল, "আমার ঘড়িটা কোন্ কোম্পানীর বলতে বল তো?"

লোকটি এগিয়ে এসে পিংকির বাঁ হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে দেখে গলা চড়াল, "তুমাকে একজন বলতে বলছে, তার হাতে ঘড়িটা কোন্ কোম্পানীর?"

"কি বলছ শুনতে পাচ্ছি না।" ছেলেটি বলল।

"তুমাকে একজন পুছ করছে, তার হাতের ঘড়িটা কোন্ কোম্পানীর?"

"টাইটান।"

"কি, টাইটান কোম্পানীর ঘড়ি তো?"

লোকটি পিংকিকে প্রশ্ন করল।

পিংকির সমস্ত চেতনা জুড়ে পরম বিস্ময়! যে সব দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, তারা যে সাজান দর্শক নয়, এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো পিংকি। কিন্তু লোকটি টেলিপ্যাথি ক্ষমতার দাবি করছে না। দাবি করছে সত্য সাঁইয়ের অলৌকিক ক্ষমতার। সাঁইবাবার বিভূতি তাবিজে পুরে মন্ত্র পড়ে দেওয়া হয়েছে। আর, তাইতেই নাকি শুয়ে থাকা বেহুঁশ ছেলেটি নিজের অজান্তেই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দিচ্ছে। আসলে উত্তর দেওয়ার ও এখন কেউ নয়। উত্তর দেওয়াচ্ছেন স্বয়ং সত্য সাঁই।

শির ওঠা লোকটি ঘুরে ঘুরে দর্শকদের তুলে দেওয়া জিনিসগুলো হাতে নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে। কখনও বা কোনও দর্শকের সামনে থমকে গিয়ে নিজেই প্রশ্ন করে, "এই ভদ্দলোকের পায়ে চটি না জুতো?"

ছেলেটি উত্তর দেয়, "জুতো?"

পল্লবী পিংকিকে খোঁচাল, "আমি একটা কোশ্চেন করব।"

"কর্‌না।"

"ওকে ডাক্‌।"

"ডাকছি।"

পিংকি সুযোগ খুঁজতে লাগল। সাঁই ভক্ত লোকটি পিংকির কাছাকাছি বা মুখোমুখি হলে ডাকবে।

পল্লবী ভবানীপুরে থাকে, বেথুনে পড়ে। ক্লাশ নাইনের ছাত্রী। ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে, টানা নাক, উজ্জ্বল চোখ, একমাথা আঙুরের থোকার মত কাল চুল 'স্টেপ-কাট' করা। লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি পেরিয়েছে গত মাসেই। পল্লবী অমরনাথরা তিন পুরুষ ধরে ভবানী-পুরের বাসিন্দা। ভবানীপুরে ওদের একটা ওষুধের দোকান ও একটা ভি.ডি.ও. ক্যাসেট লাইব্রেরি রয়েছে। 'পল্লবী ভি.ডি.ও. লাইব্রেরি' কলকাতায় অন্যতম বড় ভি. ডি. ও. লাইব্রেরি। পল্লবী ক্যালকাটা ক্যারাটে ক্লাব ক্যারাটে শিখছে বছরখানেক হলো। পিংকি ওই ক্লাবেরই সদস্য। সেই সুবাদেই ওদের দুজনের বন্ধুত্ব। পিংকি আজ পল্লবীর বাড়ি এসেছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মাদাম কুলাগিনার ওপর আরো কিছু ভি. ডি ও. ক্যাসেট পাওয়া যায় কিনা দেখতে। পল্লবীর বাবা রাজেন্দর অমরনাথ যেমন স্মার্ট, তেমনি সুদর্শন। বয়সটা যে পঁয়তাল্লিশের আশে-পাশে রাজেন্দরকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। পিংকি অর্থাৎ পিনাকী একে পল্লবীর বন্ধু, তায় পল্লবীর জোরাল তাগাদা—কুলাগিনার ক্যাসেট না থাকলেও যেমন করে হোক যোগাড় করে দিতে হবে। অতএব রাজেন্দর বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

লাইব্রেরিতে কুলাগিনার ক্যাসেট ছিল না। রাজেন্দর এদিক-ওদিক কয়েকটা ফোন করলেন। অনেককে লাগিয়ে দিলেন ক্যাসেট যোগাড় করার কাজে, ভরসা দিলেন, "চেষ্টা করছি। মনে হয়, কাল সকালের মধ্যেই বুঝতে পারব, যোগাড় হবে কি না। ক্যাসেট পেলে দুপুরের মধ্যে তোমার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

"আপনি আমাকে ফোনে খবর দিলে আমি এসে..."

পিংকির কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই রাজেন্দর অমরনাথ পিংকির পিঠে আদর করে বিরাট এক থাবা বসিয়ে বললেন, "সে তোমার চিন্তা করতে হবে না। দরকার হলে পল্লবীই পৌঁছে দেবে। পল্লবী তো আবার তোমার মায়ের রান্না, গান, এ সবের ভক্ত। ও তো তোমাদের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পেলেই খুশিই হয়।"

ভি. ডি. ও. লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে পিংকি এসেছে ময়দানে। পিংকির মোটর বাইকে সওয়ার হয়েছে পল্লবীও। পিংকির ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। বয়স হয়নি, তাই লাইসেন্স পাওয়ার প্রশ্ন নেই। তবু বাইকটা পিংকির সর্বক্ষণের সঙ্গী। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা বাহাত্তর কেজি ওজনের পিংকি স্ট্রিট হকের মতো মুখ ঢাকা হেলমেট পরে যখন ড্রাইভ করে তখন কোনও ট্রাফিক পুলিশের মনেই সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক হয় না।

পিংকি লোকটিকে ঈশারায় ডাকল। লোকটি এগিয়ে আসতেই পল্লবী নিজের ডানহাতের আঙুলের আংটিটা দেখিয়ে বলল, "এটা কিসের আংটি ও বলতে পারবে?"

লোকটি পল্লবীর ডানহাতটা ওপরে তুলে ধরে হাঁকল, "এই মেম-সাহেবের হাতে একটা আংটি আছে, আংটিটা রূপোর না সোনার?"

"সোনার।"

কালো চাদরের তলা থেকে ভেসে এলো জবাব।

পল্লবী বলল, "না, না, আমি জানতে চাইছি আংটিতে কি পাথর আছে?"

আংটিটা একবছর ধরেই দেখছে পিংকি, হিরের আংটি। ক্যারাটে প্র্যাকটিসের সময় খুলে কিটস্‌ব্যাগে রেখে দেয়।

শির ওঠা লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আংটির পাথরে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "একজন, এক সওয়াল, এক জবাব। আজ আর আপনার সওয়ালের জবাব দেবে না। ইচ্ছে থাকলে কাল এই সময় আবার আসুন। জবাব পেয়ে যাবেন।"

২৪ ডিসেম্বর।

আজ ময়দানের সেই জায়গা, সেই পরিবেশ। দর্শক পাল্টালেও, দর্শকরা সেইরকমই বেরসিক। শুধু বিনে পয়সায় তামাশা দেখে সময় কটাচ্ছে। আজও শিরা ওঠা লোকটির পরনে কালকের পোশাক।

পল্লবীকে নিয়েই এসেছে পিংকি। পল্লবীর বাবা একটা অসাধ্য সাধন করেছেন। কুলাগিনান একটা ভি ডি. ও. ক্যাসেট যোগাড় করে দিয়েছেন। বাইশ মিনিটের ক্যাসেট, পল্লবী ক্যাসেটটা পৌঁছে দিতে এসেছিল। পল্লবী আসার আধঘণ্টা আগে বাবা বেড়িয়েছেন। আজও অফিস যাননি।

পিংকি ক্যাসেটটা চালিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। এটায় কুলাগিনা অন্য পোশাকে, অন্য মেজাজে। সম্ভবত সম্প্রতি তোলা। পোশাকে মার্কিন কালচারের ছাপ, অনেক তন্বী হয়েছেন। স্টেজে চোখ-বাঁধা কুলাগিনা দাঁড়িয়ে শরীর মৃদু ছন্দে দুলিয়ে চলেছেন। সহকারী সেই একই লোক। তার পোশাকেও চটক্ চোখে পড়ার মত।

ক্যাসেট দেখতে দেখতে কখনও ক্যাসেট সামান্য ব্যাক করাচ্ছিল, স্টপ করিয়ে ডাইরিতে কি সব নোট করছিল। পাশের ঘরে টেপ-ডেকে প্রীতির ক্যাসেট বাজছে। পল্লবী পুডিং খেতে খেতে প্রীতির গান শুনছে ও মাঝে মধ্যে প্রীতির সঙ্গে কথা বলছে।

বাইশ মিনিটের ক্যাসেট শুনে উঠতে পিংকির লাগল পাকা চল্লিশ মিনিট। ভি. সি. আর. বন্ধ করে পিংকি পাশের ঘরে এলো।

"আমার পুডিং কই?"

"এসে গেল মিষ্টি খাওয়ার ক্ষুদে রাক্ষস," প্রীতি হালকা রসিকতা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন পিংকির জন্যে পুডিং আনতে।

"শোন্ আর সময় নেই। এখনই আমাদের বেরতে হবে। ময়দানে যাব। কাল তুই যে প্রশ্নটা করেছিলি, আজ তার উত্তরটা জানতে হবে।"

কথাগুলো বলেই পিংকি দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। বাবার

সোনিও টেপ রেকর্ডারটায় একটা নতুন ব্ল্যাঙ্ক ক্যাসেট ঢুকিয়ে টেপটা প্যান্টের পকেটে পুরল।

এই মুহূর্তে টেপ-রেকর্ডারটা প্রতিটি কথা ধরে রাখছে। আজও সাঁই ভক্ত ঘুরছে দর্শকদের মধ্যে। এক একজনের এক একটা জিনিস তুলে ধরে প্রশ্ন করছে। কাপড়ে ঢাকা ছেলেটি উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

লোকটি এক সময় এগিয়ে এসে পল্লবীর ডানহাতটা তুলে ধরে বলল, "এই মেম সাহেবের আঙটিতে কি পাথর আছে?"

"হীরে।"

ছেলেটি উত্তর দিল।

পিংকি একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে লোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে পল্লবীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

আনন্দবাবু সন্ধে থেকে এখন পর্যন্ত কয়েবার কুলাগিনার ক্যাসেট দুটো চালিয়েছেন। অ্যাশেট্রেতে সিগারেটের টুকরো বেড়েছে। প্রীতি 'সুর-সঙ্গম' থেকে না ফেরা পর্যন্ত লক্ষ্মীই তিনবার চা বানিয়ে দিয়েছে। ক্যাসেট দেখতে দেখতে মাঝে-মাঝেই উত্তেজিত হয়েছেন আনন্দবাবু। কখন ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করেছেন, কখনও বা কি যেন ভাবার চেষ্টা করছেন চোখবুজে বিছানায় শবাসন করে।

প্রীতি ফিরে এসেই একমগ কফি দিয়ে গেছেন, সঙ্গে সল্টেড কাজু। নীরবেই দিয়ে ফিরে গেছেন। চিন্তাকে বিঘ্নিত করতে চাননি।

পিংকির ঘরে পিংকিও ব্যস্ত। টেবিলে খোলা ডাইরি, খোলা ফেল্ট পেন। ওয়াকম্যান চালিয়ে পিংকি শুনছে আজকের ময়দানের ক্যাসেটটা।

বেশ কয়েকবার শুনেছে ক্যাসটটা। কালকের ময়দানের ওই সাঁই ভক্ত লোকটি ও কিশোরের স্মৃতি বার বার ঘুরে-ফিরে আসছিল। লোকটির প্রশ্ন ও কিশোরটির উত্তর বার-বার কানে বাজছিল, — "এই

ভদ্দরলোক ধুতি পরেছেন, না প্যান্ট ?"

"প্যান্ট।"

"এই ভদ্দলোকের পায়ে চটি না জুতো ?"

"জুতো।"

"আংটিটা রূপোর না সোনার ?"

"সোনার।"

"হিসাব সে বোলো, এই ভদ্দরলোকের হাতে কি কোম্পানীর খড়ি ?"

"এইচ. এম. টি.।"

"আভি বোলো তো, কি কোম্পানীর ঘড়ি ?"

"অলউইন।"

পিংকি ওয়াকম্যানের ক্যাসেটটার বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো আবার শুনতে থাকে –

"হিসাব সে বোলো, এই ভদ্দরলোকের হাতে কি কোম্পানীর ঘড়ি ?"

"এইচ. এম. টি.।"

"আভি বোলো তো, কি কোম্পানীর ঘড়ি ?"

"অলউইন।"

পিংকি ওয়াকম্যান বন্ধ করে দিল। ওর মাথায় ঘুরতে থাকে আবার কিছু শব্দ – "হিসাব সে বোলো..."

"এইচ. এম. টি.।"

"আভি বোলো..."

"অলউইন।"

"তুমাকে পুছ করছে..."

"টাইটান।"

"হিসাব...", "এইচ. এম. টি.।"

"আভি...", "অলউইন।"

"তুমাকে...", "টাইটান।"

পিংকি উত্তেজনায় ডাইরিটা খুলে দ্রুত চোখ বোলাতে লাগল কুলাগিনার তুটো ভি. ডি. ও. ক্যাসেট দেখে কিছু নোট করেছিল পিংকি। সেই নোটগুলোতেই চোখ বোলাতে লাগল।

লম্বা রুলটানা খাতা নিয়ে বসে গেল পিংকি। কার্বন পেপার ফেলে পাতার পর পাতা লিখে গেল। লেখা যখন শেষ হলো তখন রাত দশটা পঁয়তিরিশ। বাবার ঘরে যখন উঁকি দিল তখন বন্ধ ঘর সিগারেটের ধেঁায়া ও পোড়া তামাকের গন্ধে ভরপুর। ভি. ডি. ওতে চলছে কুলাগিনার ক্যাসেট। আনন্দবাবু কিন্তু ক্যাসেট দেখছেন না। এক মনে কি সব লিখে যাচ্ছিলেন একটা খাতায়। বাঁ হাতে জ্বলছে উইলস।

নিঃশব্দে ভি. ডি. ও. বন্ধ করে দিল পিংকি। আনন্দবাবু লেখা থেকে চোখ তুললেন, "ও তুই।"

পিংকি বাবার হাতে তুলে দিল সদ্য তৈরি লেখার কার্বন-কপি।

আনন্দবাবু লাইন চারেক সবে চোখ বুলিয়েছেন, প্রীতি ঘরে ঢুকলেন, "তুজনেই এখানে দেখছি, চল খেয়ে নাও। তারপর যত রাত খুশি তোমরা কুলাগিনা রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাও।"

আনন্দবাবু পিংকির দেওয়া কাগজগুলো টেবিলে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পিংকিকে বললেন, "আজ রাতের মধ্যেই আমার তৈরি হয়ে যাবে। তোর?"

"আমারও তৈরি হয়ে যাবে।"

"আর তু'জন কাকে নিই বল তো?"

প্রীতি বললেন, "কেন? আমি।"

পিংকি বলল, "চার নম্বর পল্লবী। ওকেও তৈরি করে নেব আগে খেয়ে নেই। তারপর পল্লবীকে একটা ম্যারথান ফোন করতে হবে।"

প্রীতি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "তোদের কোডে কথা আমাকে দেখলেই শুরু হয়, নারে? এইসব কোডে কথা বন্ধ করতো।"

"সে কি, আমি তো ভাবছিলাম, এখন থেকে কোডে কথা বলা

আর বেশি করে রপ্ত করব।"

পিংকি মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল।

পিংকির কথায় আনন্দবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন ; চিন্তামুক্ত প্রাণখোলা হাসি।

মাদাম কুলাগিনার চোখটা বাঁধার জন্য রুশ বিজ্ঞান আকাদেমির পক্ষে ডঃ কোভজারভ আহ্বান জানালেন সামনের সারিতে বসে থাকা আনন্দবাবুকে। আনন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আনন্দবাবুর বাঁ পাশে প্রীতি, ডাইনে পিংকি ও পল্লবী।

আনন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন। আনন্দবাবুকে আহ্বান জানানর সঙ্গে সঙ্গে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের হাসি হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মাদাম কুলাগিনা।

পিংকি অবাক চোখে কুলাগিনাকে দেখছিল। মোমের তৈরি পুতুল যেন। বয়স অনুমান করা শক্ত। প্রচণ্ড ঝলমলে পোষাকে আলো করে রেখেছেন আজকের সাবাদিক সম্মেলন।

পিংকিরা ঢুকেছে হু'টো পঁয়তাল্লিশে। তখন কলকাতা প্রেস ক্লাবের ময়দানের তাঁবু উপছোন ভিড়। ঢোকার মুখেই প্রচুর ছবি তুলেছেন চিত্র-সাংবাদিকেরা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে বহু নিউজ এজেন্স ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা হাজির থাকবেন, সেটা পিংকি আগেই অনুমান করেছিল। সাংবাদিকদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে পিংকি বুঝে নিয়েছে, ওর অনুমান ছিল নির্ভুল। কিন্তু এত বিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতি পিংকি অনুমান করতে পারেনি।

ঠিক তিনটেয় 'যুব-সমীক্ষা' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক অসিত চক্রবর্তী ঘোষণা করলেন, "আজ এক চরম পরীক্ষার দিন, অলৌকিক ক্ষমতার অস্তিত্ব প্রমাণের দিন, আবার অলৌকিক বলে বাস্তবে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই—এই বক্তব্য প্রমাণেরও দিন। মাদাম কুলাগিনা এসেছেন সুদূর সোভিয়েত দেশ থেকে—এদেশে তাঁর টেলিপ্যাথি ক্ষমতা ঘিরে

যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে, সেই বিভ্রান্তি দূর করতে। এখানে উপস্থিত আছেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির আকদেমিশিয়ান কোভজারভ। সোভিয়েট বিজ্ঞান আকদেমির তরফে যে বিজ্ঞানীরা মাদাম কুলগিনার টেলিপ্যাথি ক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন কোভজারভ। র‍্যাশনালিস্টস আসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক আনন্দ ঘোষ হঠাৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করতে শুরু করলেন, মাদাম কুলগিনার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। অলৌকিক ক্ষমতা বলে কুলাগিনা যা ঘটাচ্ছেন তার পেছনে রয়েছে গোপন কৌশল। মাদাম কুলাগিনাকে অলৌকিক টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী বলে সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদেমির ঘোষণার পিছনে রয়েছে বিজ্ঞানীদের চূড়ান্ত অক্ষমতা, অথবা রাশিয়ার আবার অন্ধকারের কালো দিন ফিরিয়ে আনতেই নাকি মাদাম কুলাগিনার অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে আমরা জেনে-শুনেই মিথ্যা প্রচায় চালাচ্ছি।

"আনন্দ ঘোষ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভণ্ড অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের ভণ্ডামী ফাঁস করে যথেষ্ট নাম করেছেন, দেশের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। তিনি যে ভণ্ডামী ধরছেন, খুব ভাল কাজ করছেন। আমরা তাঁর কাজকে সম্মান জানাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সবাই ভণ্ড। এ জাতীয় ধারণা তিনি যদি আঁকড়ে ধরে থাকেন, তাহলে আমরা বলতে বাধ্য হবো, তিনি একজন আত্ম-প্রচারক ছাড়া কিছুই নন। তিনি যদি ভেবে থাকেন, যেখানে বিজ্ঞানীরা তল পান না, সেখানেও তিনি নাক গলাবার অধিকারী, তাহলে বলতেই হয় তিনি আত্মপ্রচারের স্বার্থে যুক্তিবাদীদের অবতার হয়ে উঠতে চাইছেন বলেই এমন সব উল্টো-পাল্টা কথা প্রচার করছেন।

"যাই হোক,এই বিতর্কের অবসান ঘটবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। সুতরাং আর কথা না বাড়িয়ে আসুন আমরা মূল অনুষ্ঠানে ঢুকি!"

এরপর অসিত চক্রবর্তী একে একে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন কুলাগিনা, তাঁর সহকারী বরিস, বিজ্ঞানী ডঃ কোভজারভ এবং আনন্দ

ঘোষের সঙ্গে।

কুলাগিনা, বরিস ও কোভজারভ উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলেও, আনন্দবাবুর এক মিনিটের বক্তব্যেও ছিল যথেষ্ট ঝাঁঝ। তিনি বলেছিলেন, "অসিতবাবু তাঁর ভাষণে আমার বিরুদ্ধে যে ধরনের ব্যক্তি আক্রমণ চালালেন, সেগুলো আমার কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগেও অনেক অবতার, তাঁদের এজেন্ট ও অনেক ভেজাল বিজ্ঞান-আন্দোলনকারীরা এ-ধরনের আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁরা এ-ভাবে যুক্তিবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের গড়ে তোলা আন্দোলনের ক্ষতি করার চেষ্টা আগেও করেছেন, এখনও করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। এই ধরনের অপচেষ্টা যে হচ্ছে, হবে, তা আমরা জানি। সেই সঙ্গে এও জানি, এক সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানীরা এক জোট হয়ে পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরছে বলে ঘোষণা করেও যেমন সত্যকে চেপে রাখতে পারেননি, তেমনি আজ যে সব বিজ্ঞানী অলৌকিকতার পক্ষ নিয়েছেন, তাঁরাও পারবেন না সত্যকে চেপে রাখতে, সত্য প্রকাশিত হবেই। ইতিহাস একদিন এঁদের বিচার করবেই।"

বক্তব্য রেখে আনন্দবাবু এসে বসলেন প্রথম সারিতে। পিংকি লক্ষ্য করেছে তাঁবুর তলায় সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকদের মধ্যে ক'জন তাঁদের সমিতির সভ্য আছেন। পথিককাকু, পবিত্রকাকু, কল্যাণদা, তাপসদা, বিশুদা, পূষণদা যুগল জেঠুকে দেখেছে পিংকি।

আনন্দবাবু কুলাগিনার চোখ বেঁধে দিলেন একটা বড় রুমালে। কুলাগিনার হাতের মুঠোয় মাউথ-পিস আর একটা মাউথ-পিস মুঠো বন্দী করে দর্শকদের দিকে এগোলেন বরিস।

কুলাগিনা মুখ খুললেন। সুরেলা গলায় এবং কিছুটা অস্পষ্ট ইংরেজীতে বললেন, "আপনাদের সবার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে মিস্টার বরিস ইংরেজীতে প্রশ্ন করবেন, আমিও উত্তর দেব ইংরেজিতে। দোভাষীর কোনও কারচুপি করার সুযোগ থাকবে

না। আমার এই প্রস্তাবকে আপনারা নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবেন।"

বিপুল হাততালি দিয়ে সকলে যে ভাবে কুলাগিনার বক্তব্যকে স্বাগত জানালেন, তাতে পিংকি কুলাগিনার শোম্যানশিপের তারিফ না করে পারল না।

হাততালির প্রতিটি শব্দ প্রীতির বুকের শব্দকে আরো দ্রুত করেছে। প্রীতি বুঝতে পারছিলেন তাঁর রক্তচাপ বাড়ছে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কব্জিটা টিপে ধরে হৃদস্পন্দনের গতি মাপার চেষ্টা করলেন। পনের সেকেণ্ডে চব্বিশ বার। কপালের দু'পাশে টিপ্ টিপ্ ব্যথা অনুভব করলেন। প্রেসার বেড়েছে।

পল্লবী এই প্রথম কোনও সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির থাকার সুযোগ পেয়েছে, তাও এমন একটা বড় মাপের সাংবাদিক সম্মেলনে। তবু একটুও ঘাবড়ে যায়নি। বরং মজাই লাগছে।

বরিস এক সাংবাদিকের পকেট থেকে ডট্ পেন তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এটা কি তুলেছি?"

"ডট-পেন।"

বরিস এগোলেন। ছবি উঠছে অনবরত। বরিস থামলেন, এক সাংবাদিকের হাতের রাইটিং প্যাড তুলে নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, "আমার হাতে কি?"

"রাইটিং প্যাড।"

বরিস ডাইনে ঘুরলেন, একজনের ক্যামেরায় আঙুল ছোঁয়ালেন।

"কিসে আঙুল ছুঁইয়েছি?"

"ক্যামেরায়।"

বরিস এগোলেন। যীশু চৌধুরী তাঁর প্রেস-কার্ডটা পকেট থেকে তুলে বললেন, "জিজ্ঞেস করুন তো এটা কী?"

বরিস প্রেস-কার্ডটা হাতে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরলেন। কার্ডটা বার কয়েক নাচিয়ে হাঁকলেন, "আমার হাতে কি নাচছে?"

"প্রেস-কার্ড।"

বিপুল অভিনন্দনে আপ্লুত হলেন কুলাগিনা। বরিস এবার

আনন্দবাবুর কাছে গিয়ে বললেন, "আপনি আপনার ইচ্ছেমত যা খুশি হাজির করুন। আমি দেখব। আমার চিন্তা তরঙ্গ ধরে আমি যা দেখছি তারই বর্ণনা দেবেন মাদাম কুলাগিনা।"

আনন্দবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বরিসের মুঠো থেকে মাউথ পিসটা নিলেন। ইংরেজিতে বললেন, "আপনারা এতক্ষণ মাদাম কুলাগিনার টেলিপ্যাথি ক্ষমতা দেখলেন। এবার আপনাদের সামনে হাজির করছি আমাদের সমিতির সভ্য পিনাকীকে ও তার বান্ধবী পল্লবীকে। দু'জনে ক্লাস নাইনের ছাত্র-ছাত্রী। নেহাৎই কিশোর-কিশোরী। পল্লবীর চোখ বাঁধা থাকবে। আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা যে কোনও জিনিস তুলে ধরুন। পিনাকী দেখবে, প্রশ্ন করবে। দেখুন, পল্লবী প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দেবে।"

হল জুড়ে প্রচণ্ড উত্তেজনা, সাংবাদিকদের গুঞ্জন। আনন্দবাবুর ঘোষণায় কুলাগিনা একটানে চোখ-বাঁধা রুমাল খুলে ফেলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন আনন্দবাবুর দিকে। সাংবাদিকদের উত্তেজনার ছোঁয়াচ লেগেছে অসাংবাদিকদের মনে। প্রীতি আনন্দবাবুর কথায় হোঁচট খেলেন, আনন্দর মাথা খারাপ হয়নি তো? এই চিন্তায় শঙ্কা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আনন্দবাবুর দিকে।

আনন্দবাবুর মস্তিকের সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ ছিল অসিতবাবুর। এমন একটা মানসিক চাপে মাথা খারাপ হওয়া আশ্চর্যের নয়। তবুও শত্রু মানে শত্রুই। এই সুযোগ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন অসিতবাবু। উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আনন্দবাবু আমাদের সামনে এখন হাজির করবেন ভারতবর্ষের এক টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারীকে। আমরা নতুন এক আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাকে স্বাগত জানাব, তাকে অভিনন্দিত করব। কিন্তু এত কিছুর পরেও বলব, আনন্দবাবু তাহলে স্বীকার করলেন, টেলিপ্যাথির বাস্তব অস্তিত্ব, স্বীকার করলেন কুলাগিনার টেলিপ্যাথি ক্ষমতাকে।"

উঠে এসেছে পিংকি ও পল্লবী। প্রীতি অবাক। আনন্দর নয় মাথা

খারাপ হয়েছে, তাই বলে ওরা ছুটোতে উঠে গেল কোন বুদ্ধিতে ? আনন্দ একটু একটু করে যে ভাবে নিজেকে একটা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছিলেন, তাতে মানসিক চাপ বেচারার ওপর ধারাবাহিক ভাবে বেড়েই চলেছিল। প্রীতি জানতেন, একদিন এমনটাই ঘটবে।

আনন্দবাবুর আহ্বানে ডঃ কোভজারভ পল্লবীর চোখ বেঁধে দিলেন। পল্লবীর হাতে তুলে দেওয়া হলো একটা মাউথপিস। আর একটা মাউথপিস তুলে নিল পিংকি।

এরপর আধ-ঘণ্টা ধরে যা হলো, তাকে বলা চলে—'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। সাংবাদিকরা, অসিতবাবু কোভজারভ, এমন-কি কুলাগিনা পর্যন্ত যে যখন যে জিনিসটি পিংকির হাতে তুলে দিয়েছেন, পিংকির প্রশ্নের উত্তরে পল্লবী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর দিয়ে মাতিয়ে দিয়েছে। ক্যামেরার ফ্লাশের আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

বিস্ময়ের পর আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আনন্দবাবু ঘোষণা করলেন, "না পিনাকী বা পল্লবী কেউই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়, টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী নয়, যেমন অধিকারী নন মাদাম কুলাগিনা ও মিস্টার বরিস।"

"পিংকি পল্লবীর লৌকিক কৌশলটা কী ?"

পথিক গুহ জিজ্ঞেস করলেন।

"সেটা বরং পিংকিই বর্ণনা করছে। আনন্দবাবু জানালেন।

পিংকি শুরু করল "আমি যখন প্রশ্ন করছিলাম তখন প্রশ্নের কথাগুলোর মধ্যেই সংকেতে জানিয়ে দিচ্ছিলাম উত্তরটা কি হবে। আমি ও পল্লবী একটা দীর্ঘ তালিকা মুখস্ত করেছি রাতে। এই তালিকা মত আমার সামনে কেউ একটা কলম তুলে দিলে আমি কলম বোঝাতে প্রশ্ন করব, 'আমার হাতে কি রয়েছে ?' এই ভাবেই ঘড়ি বোঝাতে প্রশ্ন করব, 'আমি কি ধরেছি ?' ক্যামেরার ক্ষেত্রে, "আমি কি ছুঁয়েছি ?"

"আবার পোশাক-আশাকের জন্যেও সংকেত তৈরি করেছি। সংকেত তৈরির সময় মনে রেখেছি এটা শীতকাল। স্যুট পরা জানাতে প্রশ্ন করছি, 'কি ড্রেস পরেছেন?' উত্তরটা ব্লেজার হবে, এটা জানাতে প্রশ্ন করেছি, 'গায়ে কি গরম জামা চাপিয়েছেন?' সোয়েটার বোঝাতে জিজ্ঞেস করেছি, 'কি পোশাক পরেছেন?' কেউ শাল এগিয়ে দিয়ে যদি বলতেন, 'এটা কি জিজ্ঞেস করুন।' তার জন্যেও তৈরি ছিলাম। তখন আমার প্রশ্নটা হতো, 'কি গরম কাপড় চাপিয়েছেন?' জ্যাকেট হলেও অসুবিধে হতো না। জ্যাকেট বোঝাতে বললাম, 'কি শীতের পোশাক চাপিয়েছেন?' কারো পায়ে চটি আছে এটা বোঝাতে প্রশ্ন করেছি, 'জুতো না চটি?' উত্তরটা ছিল—জুতো না; চটি। অর্থাৎ জুতো নয়, চটি। আমার সংকেত পাঠাবার ব্যবস্থা যদি বন্ধ করে দেওয়া হতো, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যদি শুধু একই কথা বলতে বাধ্য করা হতো, যেমন ধরুন বলতে বলা হতো—প্রশ্নগুলো আমাকে করতে হবে শুধুমাত্র 'এটা কী' বলে, তাহলে পল্লবীর পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হতো না। একই-ভাবে মিস্টার বরিস যদি শুধুমাত্র 'এটা কী?' বলে প্রশ্নগুলো করতে থাকেন, কুলাগিনার পক্ষেও উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ চিন্তা-তরঙ্গ কোন দিনই এ-ভাবে পাঠান যায় না, ধরাও যায় না। এর পরেও যদি কুলাগিনা তাঁর টেলিপ্যাথি ক্ষমতার প্রমাণ দিতে রাজি থাকেন তো তিনি যেন আবার উঠে দাঁড়ান। আমি চোখ বেঁধে দিচ্ছি।"

সকলের দৃষ্টি যখন কুলাগিনার দিকে তখন কুলাগিনা হঠাৎ গোঁ-গোঁ' করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ঘন ঘন আলোর ঝলকের মধ্যে ছবি উঠছে। পল্লবী টেবিলের ওপর রাখা একটা জলের গ্লাস তুলে নিল। উদ্দেশ্য, কুলাগিনার চোখে-মুখে ছেটান। আনন্দবাবু পল্লবীর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে আবার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "জলে জ্ঞান ফিরবে না। লজ্জা ঢাকতে অজ্ঞানের অভিনয় করছে যে।"



মরুয়াবিলের অলৌকিক রহস্য

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

তাঁবু থেকে পিংকি যখন বেরিয়ে এলো তখন আকাশে ভোরের আলো। বেশ শীত শীত করছে। গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে নিলে মন্দ হতো না। নেই, তাতেও ভালই লাগছে। মা বাবার এখনও ঘুম ভাঙেনি। পিংকি মা আর বাবার সঙ্গে রয়েছে একটা তাঁবুতে। পাশের তাঁবুতে আছেন দিব্যেন্দু চট্টোপ্যাধায়, অনন্তকুমার ও অনন্তকুমারের অ্যালসেসিয়ান বাঘা। দিব্যেন্দুকাকু, অনন্তকাকু নিশ্চয়ই এখনও ঘুমোচ্ছেন। জেগে থাকলে ওঁদের তাঁবু থেকে কোনও সাড়াশব্দ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। দুটো তাঁবু থেকে একটু তফাতে ছোট একটা তাঁবু পড়েছে। ওটা এই তিন তাঁবুর ভাঁড়ার ঘর প্লাস সুবল পাত্রের টেমপরারি আস্তানা। তারই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিশির ভেজা একটা নীল মারুতি জিপসি ও একটা সাদা অ্যামবাসেডার। জিপসিটা অনন্তকুমারের। ওরই মাথায় চেপে এসেছে তিনটে তাঁবু সমেত অনেক কিছু। ভেতরের সওয়ারী ছিলেন অনন্তকুমার, সঙ্গী সুবল পাত্র ও বাঘা। ওটা এসেছে কটক থেকে। অ্যামবাসেডারটা দিব্যেন্দু চট্টোপ্যাধায়ের। কলকাতা থেকে সারাটা পথ পালা করে গাড়ি চালিয়েছেন দিব্যেন্দুকাকু ও বাবা অর্থাৎ আনন্দ ঘোষ। পিছনে সীটে বসে দৃশ্য দেখে সময় কাটিয়েছে পিংকি ও পিংকির মা প্রীতি।

বেড়াতে আসার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎই হয়ে গেল। তাঁবুতে থাকার অভিজ্ঞতা পিংকির এই প্রথম। দারুণ উত্তেজনা অনুভব করেছে তাঁবুতে থাকতে হবে শুনে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। পাহাড়-বন তারই মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে কয়েকটি প্রাণী—ভাবতেই কেমন একটা অদ্ভুত সুন্দর শিহরণ অনুভব করছিল।

পিংকি পায়ে পায়ে এগুলো সুবলের তাঁবুর দিকে। ভেতরে উঁকি

মারল। সুবল নেই। তাঁবুর এ-পাশ ও-পাশ নজর করতেই রঙিন বালতি দুটোর অনুপস্থিতি টের পেল পিংকি।

সুবল তবে উঠেছে, খাবার জল আনতে গেছে।

সুবল কুড়ি-বাইশ বছরের চটপটে স্বাস্থ্যবান তরুণ। গায়ের রঙ দস্তুর মতো ফর্সা। উচ্চতা পাঁচ ফুট পাঁচের মত হবে। কাল বিকেল থেকে রাতের মধ্যে পিংকির সঙ্গে দস্তুর মত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে সুবলের।

সুবল অনন্তকুমারের বাড়িতে কাজ করছে ছ'বছর হলো। অনন্ত-কুমারের খাস সাহায্যকারী। ওই নাকি অনন্তকুমারের সংসার সামলায়। অনন্তকুমার ওড়িয়া চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তম নায়ক।

এই গ্রামটার নাম ভারি সুন্দর—মরুয়াবিল। ওড়িষ্যার কটক ও ঢেঙ্কানল জেলার সীমান্তে ছবির মত সুন্দর এই গ্রাম। এখান থেকে কিছুটা হাঁটলেই বনাবৃত অঞ্চল।

পিংকি নিজেদের তাঁবুতে ঢুকে মায়ের পায়ের তালুতে সুড়সুড়ি দিল। প্রীতি চোখ মেলতেই পিংকি ইশারা করল, চল বেরিয়ে আসি।

এমন পরিবেশে বেড়ানর মজাই আলাদা। প্রীতি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। আনন্দবাবুর ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তাঁবুর বাইরে এসে মন ভরে গেল প্রীতির।

"চল ওই বনের দিকটায় ঘুরে আসি।"

প্রীতির প্রস্তাবে পিংকি এক পায়ে খাড়া। বলল "তাই চল।"

এদিকটায় কিছুটা এগিয়ে আর পথ নেই। বুনো শুয়োর আর হরিনের পায়ে পায়ে তৈরি অস্পষ্ট পথের রেখা অনুসরণ করে চলতে হচ্ছে।

এ-দিকের পথটা যে মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি হয়নি, শুয়োর হরিণদের পদচারণে রূপ পেয়েছে, এ তথ্যটা কালই অনন্তকুমারের কাছে শুনেছে পিংকি।

"পিংকি…পিংকি…"

দূর থেকে ভেসে আসা চিৎকার শুনে পিছন ফিরল পিংকি। হরিণের মত ছুটে আসছে সুবল। পিংকি যথেষ্ট ঘাবড়ে গেল। তবে কি তাঁবুতে কোনও গোলমাল? কোনও বিপদ?

প্রীতি খুব ঘাবড়ে গেলেন সুবলকে অমন দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসতে দেখে!

সুবল এসে হাঁফাতে লাগল। "ক্যাম্প থেকে আপনারা কাউকে কিছু না জানিয়ে এ দিকে চলে এসেছেন, এদিককার বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানটা খুবই বিপজ্জনক।"

প্রীতি এবার না হেসে পারলেন না। "ও এই ব্যাপার। তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমরা পথ হারাব না, আর আমাদের বুনো শুয়োরও মারবে না।"

সুবল বেজায় রকম শঙ্কিত মুখ করে বলল, "না না বউদি আপনি আমার কথাগুলো হালকা ভাবে নেবেন না। সত্যিই এদিকে আরো নানা ধরনের বিপদ আছে।"

"যেমন ?"

পিংকি প্রশ্নটা তুলল।

"আছে পুজোটা না কাটা পর্যন্ত মরুয়াবিল ছেড়ে বের হবেন না। পুজোটা কাটুক, তারপর আমিই আপনাদের বনটা ঘুরিয়ে দেখাব। কত ঘুরবেন, তখন দেখা যাবে।"

"বনে কি বাঘ আছে নাকি ? আর সেটা কি পুজোর পরেই অন্য বনে পাড়ি দেয় ?" পিংকি আবার জানতে চাইল।

উত্তর এলো না সুবলের তরফ থেকে।

প্রীতি বললেন, "পুজো শেষ হতে তো সেই এক তারিখ। আমরা কি আর ততদিন থাকবো ? দিব্যেন্দুবাবু দেখতে এসেছেন লোকেশন। দু-তিন দিনেই তার কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপরই তাঁবু গোটাও, ফিরে চল। অতএব তোমার কথা মেনে নিলে এ-বারের মত বনের সৌন্দর্য উপভোগের ব্যাপারটাই বাতিল করে দিতে হয়।"

সুবল বলল "লোকেশন দেখার সময় আপনারা এক সঙ্গে ঘুরুন না, কোনও আপত্তি করব না।"

প্রীতি বুঝলেন, কথা বাড়ানো বৃথা। অতিথিদের প্রতি অতি সতর্ক সুবলকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। কয়েক ঘণ্টা মাত্র

দেখেছেন সুবলকে। তবু ওর তৎপরতা, সরলতা, খাটায় উৎসাহ, অতিথিদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি গুণগুলো এরই মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বাংলাও বলে খুব সুন্দর।

দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় সিনামা পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নাম করেছেন। গত বছরই তথ্যচিত্র বিভাগে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন। দিব্যেন্দুবাবু আনন্দবাবুর বিশেষ পরিচিত। আনন্দবাবুর লেখা আদিবাসী সমাজ ও ডাইনি সমস্যা বইটি গত বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে। তারই ওপর ভিত্তি করে একটা ফিল্ম তৈরির করিকল্পনা করেছেন দিব্যেন্দু। সেই সুবাদে লোকেশন দেখতে দিব্যেন্দুই আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। একদিন রাত এগারোটায় বাড়ি এসে প্রীতিকে বললেন, "কোনও আপত্তি শুনছি না। আপনারও গানের স্কুল ছুটি। সুতরাং আপনিও চলুন একটা নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসবেন। তাঁবুতে তো কখন থাকেননি। এ-বার থাকবেন।"

"অনন্তকুমার আমার ফিল্মের একটা ইমপরটেণ্ট ক্যারেকটারের ভূমিকায় নামছেন। ওকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। সব ব্যবস্থা করে রাখবে। অনন্ত ওড়িষ্যার জনপ্রিয় নায়ক। কিন্তু আমি এবার প্রমাণ করে দেব, অনন্তকুমার দেশের অন্যতম সেরা অভিনেতাও।

অনন্তকুমারের সঙ্গে গত কালই প্রথম আলাপ। বয়স বছর পঁয়তিরিশ হবে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট ছুঁই ছুঁই। সুন্দর স্বাস্থ্য। ফর্সা, এক মাথা ঘন কাল চুল। পিংকি ধারণা করে নিয়েছিল অনন্তকুমার অমিশুকে হবেন। কিন্তু আলাপ হওয়ার পরই সে ধারনাটা বিদায় নিয়েছে। অনন্তকুমার সঙ্গে অ্যালসেশিয়ান বাঘাকে এনেছেন। বয়স দু'বছর। গত রাজ্য কুকুর প্রদর্শনীতে পুরস্কার জিতে এনেছে বাঘা। কোনও অ্যালসেশিয়ানের নাম বাঘা, পিংকি এই প্রথম শুনল।

পিংকিরা যখন তাঁবুতে ফিরল, তখন অনন্তকুমার দিব্যেন্দু ও আনন্দকে দেখা গেল তাঁবুর বাইরে দাঁত মাজছেন গল্প করতে করতে।

ব্রেক ফাস্টের খাওয়াটা হলো ফিস্টের ব্রেকফাস্টের মত, জেলি

ও মাখন মাখান পাঁউরুটি, কলা ও ডিম সেদ্ধ। সঙ্গে কফি।

খাওয়া শেষ হতেই দেব্যেন্দুবাবুর তাগাদায় দ্রুত তৈরি হয়ে নিলেন সুবল ছাড়া প্রত্যেকে।

দিব্যেন্দুবাবুর পরনে সেই জিন্‌সের প্যান্ট ও সুতির সার্ট। পিংকি দিব্যেন্দুকাকুকে এই ধরনের পোশাক ছাড়া কখনও অন্য কোনও পোশাকে দেখেনি। পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, শ্যামলা রঙ, বই পড়তে ভালবাসেন। গত তিন মাসে পিংকিদের বাড়ি অনেকবার এসেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকেছেন। ইজিচেয়ারে বা খাটে গা এলিয়ে দিয়ে শুধুই বইয়ের পাতা উল্টেছেন। এতই নিঃশব্দ তাঁর উপস্থিতি যে ঘরে একজন বাড়তি লোকের উপস্থিতি প্রায় টের পাওয়া যায় না।

দিব্যেন্দুকাকুর কাঁধে একটা চামড়ার ব্যাগ। কালই দেখেছে, ওতে দুটো ক্যামেরা রয়েছে। একটা আসাই প্যানটেক্স, একটা নিক্কন। একটায় রয়েছে সাদা-কালো ফিল্ম, একটায় রঙিন।

অনন্তকুমারের পরনে সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি ও সাদা টেরিকটনের ট্রাউজার। পায়ে নর্থস্টার জাতীয় সাদা রঙের বিদেশী জুতো। হাতে বাঘার চেন ধরা। পিংকি অনন্তকাকুর পোশাকের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, নায়কদের কি সাদা পোশাকের দিকে বাড়তি ঝোঁক আছে?

আনন্দবাবুর পরনে ভেলভেট কর্ডের ট্রাউজার ও খাদির হাফহাতা পাঞ্জাবী। কাঁধে একটা ক্যামেরা।

পাহাড়-বন ডিঙোবেন বলে গত পরশুই প্রীতি দু-সেট চুড়িদার কিনে এনেছেন গড়িয়াহাট থেকে। তারই একসেট আজ নামিয়েছেন। কাঁধে কোন ব্যাগ নেই।

পিংকি হাফ প্যাণ্ট বিদায় দিয়েছে এ-বছরই ক্লাস সেভেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। ক্লাসের প্রায় সকলেই এখন হাফ প্যাণ্ট পরলেও পাঁচ ফুট সাড়ে-চার ইঞ্চি লম্বা একটা ছেলে হাফ প্যাণ্ট পড়লে বিশ্রী দেখায় বলে পিংকির ধারণা। পিংকি ভেলভেট কর্ডের ভক্ত। নরম কাপড়, পরে আরাম। আজও তাই পরেছে। গায়ে তোয়ালের মত রোঁয়া ওঠা

গেঞ্জি। পায়ে নর্থস্টার।

একজন পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেছে। নাম প্রফুল্ল মিশ্র। মরুয়াবিলের ক্রোমাইটের খনিতে কাজ করন। শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি। বয়স চল্লিশ। কালো রঙ। পেটান চেহারা। চট্‌পটে— কি কথাবার্তায়, কি চলাফেরায়।

পাহাড়ের চাড়াই বেয়ে যত ওঠা যায় জঙ্গল ততই গভীর থেকে গভীরতর। প্রফুল্ল গাছগুলো চিনিয়ে দিচ্ছিলেন, শাল, পিয়াশাল, ধও, আসান, কতরকম নাম। বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ছবি নিচ্ছিলেন দিব্যেন্দু ও আনন্দ।

এ-সব জায়গায় শ্যুটিং হলে দৃশ্যগুলো সিনেমার পর্দায় কেমন লাগবে অনুমান করতে পিংকি বাঁ চোখটা বন্ধ করে ডান চোখের সামনে ডান হাতটা দূরবিনের মত করে দেখতে লাগল।

দূরে একটা হরিণ দেখতে পেয়ে পিংকি সেদিকে দৌড়তে যাচ্ছিল। পারল না সামনে পড়ে যাওয়া প্রফুল্ল বাধা দেওয়ায়।

"খবদ্দার একা-একা এদিক-ওদিক যাবে না।" প্রফুল্ল বেশ চোখ বড় বড় করে পিংকিকে বললেন।

পিংকি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। ছোট্টটি নেই যে পথ হারিয়ে ফেলবে। দমদম থেকে শ্যামপুকুর সাইকেল চালিয়ে ক্যারাটে শিখতে যায়। একাই চিত্তরঞ্জনে বিশুদার বাড়ি, টাটায় তারা মাসির বাড়ি ঘুরে এসেছে গত এক বছরে। প্রফুল্লবাবুর শাসনে পিংকি মোটেই খুশি হলো না।

"এদিক যেও না, ওদিক যেও না, করলে বেড়াবার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। আমি কি এখনও বাচ্চা আছি না কি, যে বড়দের হাত ধরে ধরে ঘুরতে হবে?"

পিংকি এমন কড়াভাবে কথাগুলো বলতে চায়নি। বড়দের সঙ্গে এ-ভাবে কথা বলা উচিত নয়, জানে। আরো অনেক বিনয়ের সঙ্গেই কথাগুলো বলা উচিত ছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকেই দেখতে

পাচ্ছে, এখানকার বড়রা ধরেই নিয়েছেন, শহরের মহিলা বা কিশোররা বনে-জঙ্গলে একা ঘুরতে গেলেই বিপদে পড়বে। এখানকার অধিবাসীদের কি ধারণা, মহিলা ও কিশোররা অতি দুর্বল, অবলা ? তাই বা হবে কি করে ? মরুয়াবিলে কয়েকটি ঘণ্টায় যে কজন মহিলাদের দেখেছে, তাঁদের কাউকে দেখেই তো অবলা বলে মনে হয়নি। গত শীতে ওড়িষ্যারই বেলপাহাড়িতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার মানুষদের দেখে একবারের জন্যেও মনে হয়নি মেয়েদের ওরা দুর্বল ভেবে পরাধীন করে রাখতে ইচ্ছুক। তবে কি এ জায়গার মানুষগুলোই একটু অন্য স্বভাবের ?

আনন্দবাবুই কথা বললেন, "ব্যাপারটা কি বলুন তো অনন্তবাবু? একটু আগে সুবল আমাকে বলল, 'পিংকি ও প্রীতি কাউকে কিছু না জানিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছিল। ওদের একা একা এদিক ওদিক ঘুরতে দেবেন না। কিন্তু ওরা একটু এদিক ওদিক ঘুরলে হারিয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, এই কথাটা সুবলকে বোঝাতে পারলাম না। ও বার কয়েক শুধু এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বলল, 'আসলে সামনে পুজো তো, তাই মনে ভয় হয়, কু ডাকে। যদি খারাপ কিছু হয়ে যায় ? পিংকি বাচ্চা ছেলে তো, তাইতো ওকে নিয়ে ভয়।' কিন্তু সুবলের এ ধরনের ভয়ের কারণ কি ? আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকল না। এখন আবার দেখছি প্রফুল্লবাবুও যেন কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। সত্যি বলুন তো ভয়টা কি ধরনের ?"

দিব্যেন্দু ছবি তুলছিলেন। যে অনন্তকুমারকে প্রশ্ন করা, তিনি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। এদিক-ওদিক তাকালেন। পিংকির মনে হলো কিছু চিন্তা করছেন। হয় তো ভাবছেন উত্তরটা দেওয়া ঠিক হবে কিনা। অনন্তকুমার প্যাণ্টের পকেট থেকে ক্লাসিক সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা এগিয়ে দিলেন আনন্দবাবুর দিকে। নিজেও ধরালেন একটা। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, "আসলে আমিও চাইছিলাম না এই সময়টায় আপনারা এখানে আসেন। প্রাকটিক্যালি আমাকে কোনও মত

প্রকাশের সুযোগ না দিয়েই দিব্যেন্দুবাবু খবর পাঠালেন, মরুয়াবিলের লোকেশন দেখতে আসছি। সঙ্গে আনছি, কাহিনীকার, তাঁর স্ত্রী ও কিশোর পুত্রকে। অতএব ব্যবস্থা করে রাখতেই হলো। কয়েকবার ভেবেছি, খবর পাঠাব কিনা, পুজোটা পার করে আসুন।"

"কি এমন বিপদ বলুন তো, যা পুজোর পরেই কেটে যাবে?" প্রীতি মুখ খুললেন।

"না না, বিপদ আসবে এ কথা বলছি না। তবে সাবধানের মার নেই। বিজয়াদশমী পর্যন্ত আমাদের ক্যাম্পে কাটানোই ভালো।"

প্রীতি হতাশ হয়ে দুকাঁধ ঝাঁকালেন। "সত্যিই আপনারা পাগল করে দেবেন। কিছু মনে করবেন না, আমার তো ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে আপনাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে। আপনারা কি বিশ্বাস করেন, বনে এই সময় একা ঘুরলে অপঘাতে মৃত্যু-টৃত্যু হয়? তাহলে স্পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছি এ-সবই কুসংস্কার।"

দিব্যেন্দু ওদের কথা শুনেছেন। অনন্তকুমারকে বললেন, "আপনার কথা শুনে বেশ একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। আর একটু মুখ খুলুন না।"

"এই সময় বানরিয়াদের ভয়ে স্থানীয় লোকেরাও দল না বেঁধে বনে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে ভয় পায়।"

"বানরিয়া কী?"

প্রশ্নটা পিংকির কাছ এলেও আনন্দ, দিব্যেন্দু, প্রীতি, প্রত্যেকেরই মাথায় এই প্রশ্নটাই এসেছিল, অনন্তকুমারের কথা শুনে।

"বলির জন্য মানুষ ধরার দায়িত্ব বানরিয়াদের।"

"নরবলি এই উনিশ'শ সাতাশি সালের ওড়িষ্যায়?"

আনন্দবাবু অনন্তকুমারের কথাটা নাকে বসা মাছি তাড়াবার মত করেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

"হ্যাঁ তাই। আমাদের দেশে কম্পিউটার, স্যাটেলাইটের পাশা-পাশি নরবলিও আছে। বাস্তবিকই আছে। শুধু এখানেই বিচ্ছিন্নভাবে নরবলি প্রথা টিকে রয়েছে ভাবলে ভুল করবেন। ফুলবনী, কেওঞ্ঝর,

বোলানগির, ভবানীপাটনা জেলার বনাঞ্চলগুলোতেও নরবলি হয়।"

"নরবলি কি এই সময়ই হয় ?"

শঙ্কিত প্রীতি জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ। মা দুর্গার কাছে প্রতি বছরই বলি চড়ান হয় মানুষ।"

"আপনারা এমন একটা নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বন্ধ করেন না কেন ? আপনাদের এ রাজ্যে কি পুলিশ বা সরকারী প্রশাসন বলে কিছু নেই ?"

আনন্দবাবুর কথায় ক্ষোভের সুর চাপা থাকেনি।

"আছে, নিশ্চয়ই আছে। সরকার আছে, পুলিশ আছে, প্রশাসন আছে, সব কিছুই আছে, যেমন আছে আপনাদের রাজ্যেও। আপনাদের রাজ্যে কি ডাইনি হত্যার নামে ঠাণ্ডা মাথায় খুন হচ্ছে না ? আসলে পুলিশ আর প্রশাসনের চেহারাটা সর্বত্রই একই রকম। সরকার চায় না, কোন গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে তাদের রাগিয়ে দিতে, তা সে ধর্মীয় বিশ্বাস যতই অন্ধ ও নিষ্ঠুরই হোক না কেন। কারণ এইসব পলিটিক্যাল পার্টির লীডারদের মাথায় একটাই ধান্দা ঘোরে, ইলেকশন জিততে হবে। ইলেকশন জিততে গেলে ওসব আদর্শগত সংগ্রাম-টংগ্রামের কথা মুখে বললেও কাজে করা যায় না।"

আনন্দবাবু অনন্তকুমারের কথাগুলো পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, "আপনি দূরে থেকে হয় তো পুরোপুরি খবর পান না। আমাদের সরকার কিন্তু ডাইনি হত্যা বন্ধের ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করছেন।"

"আপনার কথা মানতে পারলাম না আনন্দদা। ডাইনি হত্যার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মার্ডারের চার্জ আনা হচ্ছে না কেন ? ডাইনিদের যারা চিহ্নিত করে, সেই সব ওঝা, গুণিন, সখাদের বিরুদ্ধে কেন মার্ডারের চার্জ আনা হয় না ? সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, কেউই, আসলে আদিবাসীদের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করে না। বরং এমন উদাহরণ আমার জানা আছে—ডাইনি হত্যা বিরোধী আন্দোলনে নেতাদের বিরুদ্ধেই লোক ক্ষেপিয়েছে—আদিবাসীদের

ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপের অপরাধে। কারা ক্ষেপিয়েছে? জিজ্ঞেস করলে বলব, কারা নয়? কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে সব রাজনৈতিক দলই দেখাতে চায়—আমরা তোমাদের পাশে আছি। আদর্শ-টাদর্শকে গুলি মেরে ওদের আবেগকে আরো উসকে দিয়ে দলে টানতে চায়।

"মন্দিরের নরবলি রুখতে দুর্গাপুজোর চারদিন পুলিশ মরুয়াবিলের মন্দির ঘিরে রাখে। যদিও মন্দিরের প্রধান সেবাইত নরবলির কথা অস্বীকার করেন, তবু সাধারণ মানুষ জানে, বিশ্বাস করে, নরবলি প্রতি বছরই হয়, হবে। আসলে, এখানকার স্থানীয় মানুষ ও পুলিশদের নরবলি বন্ধ করার চেষ্টা বা আগ্রহ কোনটাই নেই। কারণ, তারাও বিশ্বাস করে, নররক্তে দেবীকে প্রসন্ন করলে মাটি উর্বর হবে, প্রধান সেবাইত মানুষকে রোগমুক্ত করার ক্ষমতা পাবেন এক বছরের জন্যে।"

দিব্যেন্দু ডাকলেন প্রফুল্লকে "প্রফুল্লবাবু।"

"বলুন," প্রফুল্ল দিব্যেন্দুর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

দিব্যেন্দু প্রফুল্লর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেন, "বিয়ে করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলে-পিলে আছে?"

"হ্যাঁ, দুটি।"

"যদি আপনার কোন সন্তানকেই নরবলির জন্য ধরে নিয়ে যায়?"

"তাই তো পুজোর মাসটা ওদের আগলে রাখি।"

"আপনি কি চান না নরবলি বন্ধ হোক?"

"তা চাইব না কেন? কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

"আসলে খরা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ কে চায় বলুন। আমাদের অসুখে-বিসুখে মন্দিরের প্রধান সেবাতেই ভরসা। তিনি কলা পড়ে দেন। কলাপড়া খেয়ে রোগ বালাই সারেও। তিনি কলা পড়ার ক্ষমতা হারান, এটাই বা কে চায় বলুন?"

"পুজোর সময় বলি দেখার যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন।" অনন্ত-কুমার বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বললেন প্রধান সেবাইত নারয়ণ খুন্টিয়াকে।

নারায়ণ খুন্টিয়ার বয়েস পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশ বলে মনে হলো পিংকির। ফর্সা, একটু ভারি চেহারা, ভুঁড়ি হয়েছে। ভুঁড়ির নীচে ধুতির কসি বাঁধা। গায়ে ফুল হাতার শার্ট। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বেশ লম্বা। মাথায় জটা, এক-মুখ দাড়ি-গোঁফ। তিন বউ, চারটি ছেলে। চার ছেলেই কটকে হোস্টেলে থেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে। নারায়ণবাবু এখানকার সবচেয়ে বড় জোতদার। এসব তথ্য নারায়ণ খুন্টিয়া নিজেই দিয়েছেন আনন্দবাবুদের।

অনন্তকুমারই নারায়ণ খুন্টিয়ার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন দিব্যেন্দু, আনন্দ, প্রীতি ও পিংকিকে। সকালে নরবলির কথা শোনার পর প্রধান সেবাইতকে দর্শন করার আগ্রহ ছিল ওঁদের সবারই। কিন্তু সাধারণ চেহারার নারায়ণবাবুকে দেখে একবারের জন্যেও ভীষণ নরবলির রক্তলোলুপ মানুষ বলে মনে হয়নি।

অনন্তকুমারদের দেখে নিজেই হাত জোড় করে নেমে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "কি সৌভাগ্য আপনারা গরীবের ঘরে পায়ের ধুলো দিলেন। আপনারা জ্ঞানী-গুণী মানুষ। আপনাদের দেখলে, সঙ্গ পেলে পুণ্য হয়।"

তারপরই বাঁজখাই গলায় হাঁক ছেড়েছেন অন্দরের উদ্দেশ্যে, "এই বিষ্টু আর ফুলমণি, বাইরে কয়েকটা চেয়ার দিয়ে যা।"

একটি লোক ও একটি বউ দৌড়োদৌড়ি করে ছ'টা গদি আঁটা চেয়ার পেতে দিয়ে গেছে। দুজনেরই গায়ের রঙ ময়লা। শীর্ণ, পাকানো চেহারা। বউটি পিংকির দিকে কেমন যেন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে-ছিল। তারপর যতটুকু সময় এখানে ছিল, তারই মধ্যে বারচারেক পিংকিকে দেখেছে ঘুরে ঘুরে। পিংকি অস্বস্তি অনুভব করেছে। বউটির ভাবলেশহীন দৃষ্টি, ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দেখে ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে সন্দেহ জেগেছে পিংকির।

ওরা দু-জনেই এ-বাড়িতে জন খাটে বোঝা যায়। কে জানে, হয় তো বেগার শ্রমিক। ওড়িষ্যায় এখনও বেগার প্রথা চালু আছে বলে গত মাসেই জানিয়ে ছিলেন পিংকির ক্লাসের হিষ্ট্রি টিচার মিস্টার যোসেফ।

"বসতে আজ্ঞা হোক।" নত চোখে গলা নামিয়ে নিয়ে এসে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বললেন নারায়ণবাবু।

সকাল থেকে দশ-বিশটা গাঁয়ের মানুষ 'কলাপড়া' নিতে আসে। তাদের বিদায় করে একটু আগে চার ছেলের সঙ্গে খেয়ে উঠেছেন— জানালেন নারায়ণবাবু। ছেলেরা পুজোর ছুটিতে এসেছে। চার ছেলেই পুজোর চারটে রাত জেগে থাকে বাবার সঙ্গে। এ কথাও জানিয়েছেন নারায়ণবাবু।

"'কলাপড়া' ব্যাপারটা কী?" আনন্দবাবু জানতে চাইলেন।

"রোগীরা আসে তিনটে পাকা কলা, তেল, সিঁদুর ও একুশ টাকা দক্ষিণা নিয়ে। তেল, সিঁদুর, কলা, মায়ের পায়ে ছুঁইয়ে এনে দেয় সেবাইতরা। তারপর রোগী কলার খোসা ছাড়ায়। যদি কোনও কলার খোসা ছাড়িয়ে দেখা যায়, কলাটা ভেতর থেকে দু-টুকরো করে কাটা, তবে বোঝা যায়, মা প্রসাদ করে দিয়েছেন। ওই কলাটা খেয়ে নিলে যে কোনও রোগ সেরে যায় মায়ের কৃপায়।"

"কি কি অসুখ সারে?"

"কি কি মানে? কলা যদি মা প্রসাদ করে দেন, তবে সেই কলা খেলে যে কোনও রোগই সারবে! পাগল, ক্যান্সার পর্যন্ত হামেশাই সারাচ্ছি।" বিনয়ের সঙ্গে সামান্য গর্ব মিশিয়ে জানালেন নারায়ণবাবু।

নারায়ণবাবুর অমায়িক ব্যবহারে সাহস পেয়ে অনন্তকুমার বলি দেখার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ রাখলেন।

"বেশ তো দেখবেন। আপনারা তো সিনেমা বানাবেন, মায়ের কাছে একটা ছাগ উৎসর্গ করুন। দেখবেন, আপনাদের ভাল হবে, ভাল সিনেমা হবে।"

"আসলে আমি ছাগবলি দেখার কথা বলছিলাম না।" অনন্তকুমার

তাঁর বক্তব্যটা সরাসরি বলতে কুণ্ঠা অনুভব করলেন। তাই ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইলেন।

"তবে কি নরবলির কথা বলছেন ?"

"হ্যাঁ।"

অনন্তকুমারের উত্তর শুনে নিমেষে মেঘের মত গম্ভীর হয়ে গেল নারায়ণবাবুর গলা।

"এখানকার মন্দিরে যে নরবলি হয় এ কথা কে বলেছে ?"

"নির্দিষ্টভাবে কেউ বলেনি। আমি তো ওড়িষ্যারই বাসিন্দা। যেমন বিশ্বাস কানে আসে নরবলির কথা, লোকে বিশ্বাসও করে। আর তাই তো প্রত্যেক করে আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। দিন দশ-বিশটা গাঁয়ের লোক আপনার কাছে ছুটে আসে।"

অনন্তকুমারের স্তুতিতেও ভিজলেন না নারায়ণবাবু। গম্ভীর গলাতেই প্রশ্ন করলেন, "আমি নরবলি দিই, প্রমাণ করতে পারবেন ?"

"না।"

"যা প্রমাণ করতে পারবেন না, তা নিয়ে আবোল-তাবোল কথা বলবেন না, গুজব ছড়াবেন না।"

"নরবলির কথায় এত রেগে গেলেন কেন ? আপনার রাগ দেখেই বরং সন্দেহ হয়—গুজবটা হয় তো পুরোপুরি গুজব নয়।"

অনন্তকুমারকে আজে-বাজে উল্টো-পাল্টা কথা বলে আক্রমণ চালানয় পিংকি আর চুপ করে সহ্য করতে না পেরে নারায়ণবাবুকে কথাগুলো বলল।

নারায়ণবাবু তীব্র হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালেন পিংকির দিকে। মনে হলো চোখ দুটো যেন ধক্-ধক্ করে জ্বলছে। মুহূর্তের মধ্যে হো-হো করে বাজখাঁই হাসিতে ফেটে পড়লেন।

অমন রক্তজল করা দৃষ্টি ও বিকট হাসি শুনে প্রীতি শঙ্কায় কেঁপে উঠলেন। মনে মনে ঠিক করে ফেললেন, আর নয়। আজ রাতটাই মরুয়াবিলের তাঁবুতে শেষ রাতে হবে। কাল সকালেই ফিরে যাবেন কলকাতায়।

"দারুণ সুন্দর যুক্তি দাও তো তুমি। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, এ-বার পুজোয় নরবলি দিলে শুধু তোমাকে দেখার সুযোগ করে দেব।"

কথাগুলো শেষ করে আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন নারায়ণ খুন্টিয়া।

২৯ সেপ্টেম্বর

পিংকিকে যে বানরিয়ারাই তুলে নিয়ে গেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই আনন্দবাবুর। সাতটার পর সুবলের ধাক্কাধাক্কি ও ডাকা-ডাকিতে ঘুম ভেঙেছে আনন্দবাবু ও প্রীতির। এত বেলা পর্যন্ত এমন বেহুঁসের মত ঘুমোন, অসম্ভব! নিশ্চয়ই কোনও ঘুমের ওষুধের সাহায্য নিয়েই ঘুম পাড়ান হয়েছে। এখনও দু-চোখে ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু পিংকি কোথায়? ওর বিছানা দেখে মনে হয় কোন ধস্তাধস্তি হয় নি।

অনন্তকুমার ও দিব্যেন্দু ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা ঘাবড়ে গেছেন। ঘাবড়াবার আরো একটা কারণ প্রীতি। ঘণ্টা দুয়েক তাঁবুর আশে-পাশে এমনকি পাহাড়ে-জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি করে যখন সুবল, অনন্তকুমার, দিব্যেন্দু ও আনন্দ একে একে ফিরে এলেন তখন বাঁধন ছেঁড়া আবেগে ডুকরে কেঁদে উঠলেন প্রীতি। ভেবেছিলেন আজই কলকাতায় ফিরে যাবেন মরুয়াবিলে শেষ রাত কাটিয়ে। কিন্তু ভাবলেন এক, হলো আর এক! তবে কি ভগবান অসাক্ষাতে থেকে প্রীতি কথা শুনে হেসেছিলেন? পিংকির জীবনে সত্যিই কি তবে যবনিকা নেমে আসবে আজ? এইভাবেই কি ভাগ্য-দেবতা প্রীতিকে একটি বারের জন্য বাকসিদ্ধ করে চরম রসিকতা করলেন? প্রীতির মনে এখন এইসব চিন্তাই অনবরত আলোড়িত হচ্ছে।

প্রীতির বুক ফাটা চিৎকার সহ্য করতে পারছিলেন না দিব্যেন্দু ও অনন্তকুনার। অনন্তকুমার ইতিমধ্যে ক্রোমাইট খনির ম্যানেজার

জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে দেখা করেছেন।

জগন্নাথ মিশ্রকে নিয়ে জিপসি ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেছেন। অনন্তকুমার গেছেন স্থানীয় থানার সাহায্য চাইতে। সময় বড় কম। আজ সপ্তমী। কে জানে আজই হয় তো বলি দেওয়া হবে পিংকিকে। স্থানীয় থানায় নারায়ণ খুন্টিয়ার যতই প্রভাব থাক জনপ্রিয় নায়কের অনুরোধ ওরা ঠেলতে পারবে না, এ বিশ্বাস অনন্তকুমারের আছে। প্রয়োজন হলে ডাইরেকটার জেনারেল অফ পুলিশ আদিত্য পট্টনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে থানা থেকেই।

আধ ঘণ্টা আগে প্রীতিকে একটা মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দিয়েছেন আনন্দবাবু। বাইরে দু-চার দিনের জন্য বেরলে ফাস্ট এইজ বক্স সঙ্গেই রাখেন। প্রীতি সঙ্গী হলে ব্লাড প্রেসার কমাবার ও ঘুম পাড়াবার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ইঞ্জেকশন সঙ্গে রাখেন।

প্রীতি এখন ঘুমোচ্ছেন। আনন্দবাবু ও দিব্যেন্দু সুবলের তাঁবুতে ঢুকলেন। সুবল এখন রান্না চাপাচ্ছে। তাঁবুর বাইরে চেনে বাঁধা রয়েছে বাঘা।

"কাল রাতে কি বাঘা চেনে বাঁধা ছিল?" আনন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

সুবল যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ। অচেনা খোলা জায়গায় চেন খুলে রাখাটা ঠিক নয় ভেবেই বেঁধে রাখা হয়েছিল।"

সুবলও এই কথাটা বার বার ভেবেছে আর আক্ষেপ করেছে, কাল যদি বাঘা চেন-বন্দী না থাকত, পিংকিকে চুরি করতে পারত না।

"সুবল, তুমি কি জান নারায়ণ খুন্টিয়া এমন কি করে, যা দেখে সাধারণ মানুষ মেনে নেয়, ওর অলৌকিক ক্ষমতা আছে?"

"কলা পড়ার ব্যাপারটা সত্যিই অলৌকিক।"

"কলা পড়া ছাড়া আর কোনও ক্ষমতার কথা শুনেছ?"

"আজ্ঞে না। তবে কানাঘুষোয় যতটুকু শুনেছি, নারায়ণ ঠাকুর প্রতি দুর্গোপুজোর বলি দিয়ে একবছরের জন্য কলা পড়ে দেওয়ার ক্ষমতা পান।"

"সে কথা আগেই শুনেছি। তুমি কখনও 'কলা পড়া' ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছ?"

"আজ্ঞে না আমি দেখিনি। প্রফুল্লবাবু স্থানীয় লোক, তিনি বোধহয় দেখে থাকবেন।"

"এখন তোমার রান্না করতে হবে না। বরং যত তাড়াতাড়ি পার একবার প্রফুল্লবাবুকে ডেকে আন।"

পিংকি নিখোঁজ। হয় তো বা বলি দেওয়ার জন্যেই ধরে নিয়ে গেছে। কত তাড়াতাড়ি মন্দির আর নারায়ণ খুন্টিয়ার বাড়িতে পুলিশী তল্লাসী চালান যায়, এটাই যখন প্রধান চিন্তা হয়ে ওঠা উচিত তখন আনন্দবাবু কেন কলা পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, দিব্যেন্দুর মাথায় ঢুকল না। তবে কি পুত্রশোকে...? না তেমন সম্ভাবনাও নেই। আনন্দবাবু খুব শক্ত মনের লোক। তবে?

"তেমন জোরাল অসুখ হলে নারায়ণঠাকুরের কাছে যাই। নিয়ে যাই তেল, সিঁদুর, তিনটে পাকা কলা আর একুশটা টাকা।"

প্রফুল্লর কথায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে আনন্দবাবুর। উত্তেজিত গলায় বললেন, "জানি, তারপর কি বলুন।"

"তারপর মন্দিরের সেবাইতদের হাতে থালা তুলে দিই।"

"জানি। তারপর বলুন।"

"সেবাইত থালাটা নিয়ে যান মায়ের পায়ে নিবেদন করতে। নিবেদন করা হয়ে গেলে ফিরিয়ে আনেন থালা।"

"হ্যাঁ। থালাটা ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া থেকে নিয়ে আসা পর্যন্ত সময় ঠিক কি কি ঘটে, একটু বিস্তৃতভাবে বলুন।"

"সেবাইত থালাটা নিয়ে যান ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করতে। নিবেদন করে আবার থালাটা ফেরৎ নিয়ে আসেন।"

"এই নিবেদন করতে যাওয়া আর ফিরে আসার মধ্যে কত সময় গ্যাপ থাকে?"

"বলতে পারব না।"

"তাও আন্দাজে? একটু ভাবুন। মনে করার চেষ্টা করুন প্রফুল্লবাবু।"

"ঘড়ি তো দেখিনি। আসলে তখন মায়ের চিন্তাতেই বিভোর থাকি। ঘড়ি দেখার সময়ই পাই না। তবে আন্দাজে মনে হয়, তিন থেকে পাঁচ মিনিট হবে।"

"ফাইন। আচ্ছা বলুন তো, ওই সময়টা সেবাইত কি করেন? তিনি কি করছেন আপনি কি দেখতে পান? না কি আপনার দিকে পুরোপুরি পিছন ফিরে থাকেন?"

"উনি সামনে ফিরে থাকেন, কি পেছন ফিরে, তা কি করে জানব। ওঁকে তো দেখাই যায় না। মায়ের দরজা ভেজান থাকে। সেবাইত থালা নিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দেন।"

"কেন? দরজা বন্ধ করেন কেন?" উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ান আনন্দবাবু। ঝুঁকে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে প্রফুল্লের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

"বাঃ, বন্ধ করবে না? মা কি আমাদের সামনে খাবেন?" আনন্দবাবুর এমন বোকা-বোকা প্রশ্নে অবাক না হয়ে পারেন না প্রফুল্ল।

"তারপর সেবাইত মায়ের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে আবার দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর থালাটা আপনার হাতে তুলে দিয়ে পরের ভক্তটির হাত থেকে থালা নিয়ে আবার দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েন মায়ের ঘরে। দরজা বন্ধ হয়। এই তো চলতে থাকে। ঠিক বলছি তো?"

"হ্যাঁ ঠিক বলছেন।"

"কলাগুলো আপনি নিয়ে কি করেন?"

"ওখানেই দাঁড়িয়ে বা বসে একটার পর একটা কলার খোসা ছাড়াতে থাকি, যতক্ষণ না কাটা কলাটা পাই।"

"কেমন ভাবে কাটা থাকে?"

"একটা খোসা ছাড়ান কলাকে ধারাল ছুরি দিয়ে কাটলে যে ভাবে কাটা থাকে, সে ভাবেই কলাটা কাটা থাকে স্পষ্ট দু'টুকরো করে কাটা।"

"ওই কলার খোসাটা কেমন থাকে ?"

"বাকি কলা দুটোর মতোই। সামান্যতম কোনও পার্থক্য থাকে না।"

"খুব ভাল মত লক্ষ্য করেছেন ? খোসায় কোনও কাটা দাগ থাকে না ?"

"না থাকে না। খুব ভাল করেই দেখেছি। আরে মশাই আমরা তো ঘাস খেয়ে বড় হয় নি। কম তো দেখিনি এই বয়সে। আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমাদের ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত নারায়ণ ঠাকুরের কাছ থেকে কলা পড়িয়ে আনেন। একটা ব্যাপার বুঝি না বাপু। শহরে থেকে দু-পাতা ইংরিজি পড়লেই আপনারা ঠাকুর দেবতাকে অস্বীকার করতে চান, এর নামই নাকি অধুনিকতা। কিন্তু আপনাদের কেউ পারবেন এমন করে খোসাকে গোটা রেখে ভেতর থেকে কলাটা কেটে দিতে। পারলে বুঝবো নারায়ণ ঠাকুরের কথা মিথ্যে। নারায়ণ ঠাকুর বুজরুক। তার আগে নয়। তার আগে নারায়ণ ঠাকুর আমাদের দেবতা।"

এখন বিকেল তিনটে পঞ্চাশ। অনন্তকুমারের তাঁবুতে বসে রয়েছেন থানার ও সি নিরঞ্জন পট্টনায়ক। মন্দির ও নারায়ণ খুন্টিয়ার বাড়িতে তাল্লাশী চালিয়েও পিংকির খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ রাজ্যের সুপার স্টার অনন্তকুমারের অনুরোধ ও সম্মান রক্ষা করতে না পারায় বাস্তবিকই খারাপ লাগছে নিরঞ্জনবাবুর।

প্রতিবছর মা দুর্গার কাছে নরবলি হয়, এ খবরটা জানা থাকলেও কোন্ গোপন কক্ষে বলির কাজটা সম্পন্ন করা হয়, এ-সব খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি কোন দিনই।

নারায়ণ খুন্টিয়া প্রভাবশালী মানী লোক। তাঁর এক কথায় বহু ভোট এদিক-ওদিক হয়। রাজনৈতিক দাদারাও তাই নরবলি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন না। এড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে তাঁরা একটিই যুক্তি দেখান—'কারো ধর্মে আমরা হাত দিতে চাই না, কারো সংস্কৃতিতে আমরা হাত দিতে চাই না।' যেখানে রাজনৈতিক দাদারা হাত দিতে

চান না, সেখানে একটি ছোট্ট থানার ও সি কোন্ ভরসায় হাত দেবেন ?

জানা কথা, নারায়ণ ঠাকুরই পিংকিকে তুলিয়েছে বানরিয়াদের দিয়ে। এও জানা, পিংকিকে বলি দেওয়া হবে। কিন্তু তবু কিছু করার নেই। কারণ, প্রমাণ নেই। নারায়ণ ঠাকুর সাধারণ অপরাধী নন যে পিটিয়ে জেনে নেওয়া যাবে পিংকি কোথায়। কে জানে, এই তল্লাশী চালানোর জলই কতদূর গড়াবে। এইসব অবতার ও রাজনৈতিক নেতাদের অশুভ আঁতাত যতদিন থাকবে, ততদিন সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই। নিজের অক্ষমতায়, ব্যর্থতায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে ও সি ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বাঁ হাতের তালুতে বার কয়েক ঠুকলেন সজোরে।

সুবল তাঁবুতে উঁকি মেরে অনন্তকুমারকে বললো, "স্যার পিংকিকে খুঁজে পাওয়ার একটা উপায় আছে।"

তাঁবুর প্রত্যেকে সুবলের কথায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। অনন্তকুমার প্রায় দৌড়ে সুবলের দু কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, "উপায়টা বল্ শিগ্‌গির।"

"আমরা বাঘাকে কেন কাজে লাগাচ্ছি না ? পিংকির পোশাক শুঁকিয়ে ওকে ছেড়ে দিন। ও ঠিক পিংকিকে খুঁজে বের করবে। পিংকি কোথায় আছে জানলে উদ্ধার ঠিকই করতে পারব।"

নিরঞ্জনবাবু এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পেলেন। বললেন, "বাঘা তো আপনার সেই প্রাইজ উইনার কুকুর। কুকুরটাকে পিংকির কোনও পোশাক শোঁকাবার ব্যবস্থা করুন। জলদি।"

আনন্দবাবু দৌড়োলেন পাশের তাঁবুতে। পিংকিকে খুঁজে পাওয়ার এই শেষ চেষ্টা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওকে খুঁজে বার করতে না পারলে চিরকালের মত নিখোঁজ হয়ে যাবে পিংকি।

নারায়ণ ঠাকুর বাজখাই গলায় চেঁচাচ্ছিলেন মন্দির চত্বরে হাজির হওয়া কয়েক'শ মানুষের উদ্দেশ্যে। ভাষাটা ওড়িয়া হলেও বুঝতে

অসুবিধে হচ্ছে না পিংকির।

"মায়ের ভক্তরা, মায়ের সন্তানরা, তোমাদেরই আজ ঠিক করতে হবে, নরবলি হবে কি না। শক্তি পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ নরবলি। তোমাদের মাটিকে এক বছরের জন্যে উর্বর রাখতে চাও কি না, তোমাদেরই ঠিক করতে হবে। নররক্ত মাটিতে না পড়লে জমি তো উর্বর হবে না। আসবে খরা, আসবে মহামারী।

"হ্যাঁ মহামারিই আসবে। তোমাদের রোগ হবে আর মরবে। যারা মরবে তারা তোমাদেরই মা, বাবা, ভাই-বোন। নরবলি না হলে মরতেই হবে। নররক্ত ঠোঁঠে না ঠেকালে তো কলাপড়ার মন্ত্র আসবে না আমার ঠোঁট বেয়ে। মাকে কলা নিবেদন করার অধিকার হারাবো। আজ যদি বলি না হয়, কাল সকালেই তোমরা দেখতে পাবে মায়ের কাছে কলা পড়ে দিলেও কলা মা গ্রহণ করবে না। কাটা কালা পাবে না।

"মানুষের জন্যে আইন। মানুষের দাবিতে আইন। তোমরা সকলে দাবি তুললে পুলিশরা তোমাদের হাতে নরবলির জন্য উৎসর্গ করা ছেলেটিকে নিশ্চয়ই দিয়ে যাবে। দিয়ে যেতে বাধ্য হবে। তোমরা কি চাও ঠিক কর। বলি হবে, কি হবে না?"

"হবে হবে, বলি হবে।" প্রচণ্ড চিৎকারে একটি কণ্ঠে এ কথা ঘোষণার পরই শুরু হলো উত্তেজিত জনতার তীব্র চিৎকার, ক্ষোভের চিৎকার। তাদের বন্দীকে তারা মুক্তি দেবে না। মায়ের চরণে বলি দেবেই।

প্রায় কুড়ি মিনিট মন্দির চত্বরেই আটকে আছেন দলবল সহ নিরঞ্জন পট্টনায়ক। বাঘাকে সামাল দিচ্ছেন অনন্তকুমার। এত মানুষের চিৎকারে বাঘা প্রচণ্ড ক্ষেপে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আগে বাঘাই তার অনুসরণকারীদের নিয়ে ঢুকেছিল নারায়ণ ঠাকুরের বাড়ি। নারায়ণ ঠাকুর চার ছেলেকে নিয়ে মন্দিরে। বাড়িতে তখন নারায়ণ ঠাকুরের তিন বউ ছাড়া রয়েছে বিষ্টু আর ফুলমণি। একটা ঘরে ঢুকে বাঘা প্রচণ্ড চিৎকার ও দৌড়োদৌড়ি শুরু

করে দিল। ঘরের সিমেন্টের মেঝে খুঁড়ে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল।

বুঝতে অসুবিধে হলো না, এ ঘরে পিংকি এক সময় ছিল। কিন্তু এখন? ঘরের মেঝের তলায় পিংকি যে শুয়ে নেই, এ বিষয়ে সকলেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। কারণ, মেঝে দেখে একটা বাচ্চাও বলে দেবে, এটা আজ দুপুরে তৈরি করা হয়নি।

নিরঞ্জনবাবুরা যখন বেরিয়ে আসছেন তখনই ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল ফুলমণি। উত্তেজনায় ওর নাকের পাটা ফুলে আছে। ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। বলল, "তোমরা যাচ্ছ কোথা? এ ঘর ছেড়ে চলে গেলে আর কোন দিনই ঘরের ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমার একমাত্র ছেলে সহদেবকে খেয়েছে রাক্ষুসী। এই নারায়ণ ঠাকুর তাকে নিজ হাতে বলি দিয়েছে। সেই সহদেবকে অতদিন পরে আবার দেখলাম। সেই চোখ, সেই মুখ। তোমরা ওকে বলি দিতে দিও না। আস, তোমাদের পথ বাতলে দিচ্ছি।"

একটা হাতলের টানে লোহার ফ্রেমে বসান মেঝেটা ঘড় ঘড় করে কিছুটা সরে গেল এক পাশে। নীচে তাকাতেই সিঁড়ির সারি চোখে পড়ল। ফুলমণিই সবার আগে নেমে পড়ল সিঁড়ি বেয়ে, তার পিছনে অন্য সকলে।

সিঁড়ি যে ঘরে এসে শেষ হয়েছে, সেখানেই দেখা মিলল পিংকির। একটা খাটিয়ার সঙ্গে হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বাইরের বিকেলের আলো এ ঘরে ঢোকে না। ঘরে আলো দিচ্ছে একটা বড় পিতলের প্রদীপ। সেই আলোতে ঘরের যে জিনিসটায় প্রথমেই চোখ পড়ে, সেটা হলো দেওয়ালে ঝোলান বিশাল আকারের চকচকে একটা খাঁড়া। খাঁড়ার তলায় একটা হাড়ি-কাঠ। হাড়ি-কাঠে ঝুলছে একটা জবার মালা ও কিছু ফুল।

পিংকির পরনে একটা লাল-পেড়ে নতুন গরদ। কপালে গোলা সিঁদুরের টিপ।

ঘরে ঢুকে ফুলমণি দৌড়ে গিয়ে পিংকির বাঁধন খুলতে শুরু

করল। ছু-চোখে ওর জল। নিরঞ্জনবাবু ফুলমণিকে সরিয়ে দিতে যেতে আনন্দবাবু এগিয়ে এসে ইশারায় নিরঞ্জনবাবুকে বললেন—ফুলমনিকে বাধা দিতে হবে না।

বাবা, পরিচিতি মানুষজন, বাঘা ও পুলিশদের দেখে পিংকি অনুমান করে নিয়েছে ঘটনাটা কি ঘটেছে। ওর উদ্ধারে বাঘা ও ফুলমণির ভূমিকার গুরুত্ব বুঝে নিতে একটু ভুল করেনি পিংকি।

সকলের আবেগ ও উচ্ছ্বাস পিংকিকে উদ্ধার করার আনন্দে কিছুটা বাঁধন ছাড়া। প্রাথমিক আবেগটুকু কেটে যেতে নিরঞ্জনবাবু বললেন, "চলুন এবার ফেরা যাক।"

কিন্তু ফেরা হলো না। এক পাশের দেওয়ালটি ঠিক এই সময় ঘড় ঘড় আওয়াজ করে এক দিকে সরে গেল। ঘরে ঢুকলেন নারায়ণ ঠাকুর। সঙ্গে ছুটি তরুণ। অল্প আলোতেও ছেলে ছুটির মুখের আদল দেখে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, নারায়ণ ঠাকুরের ছুই ছেলে।

একঘর লোক ও পুলিশ দেখে তিন জনেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক চমকটা ওরা কাটিয়ে ওঠার আগেই নিরঞ্জনবাবু তৎপরতার সঙ্গে রিভলভার উছিয়ে ওদের গ্রেপ্তার করলেন।

যে পথ দিয়ে নারায়ণ-ঠাকুর এসেছেন, সে পথ দিয়েই বের হবেন ঠিক করলেন নিরঞ্জনবাবু।

এ পথটা গেছে মন্দিরেরই একটা ঘরে। কিন্তু সে ঘর থেকে বেড়তেই পড়তে হলো ছুর্গাপুজো দেখতে আসা মানুষদের সামনে। গ্রামের মানুষগুলো তাদের মন্দিরের প্রধান সেবাইত ও তাঁর ছুই ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় পুলিশের হাতে দেখে হতচকিত, পুজোর দিনে এ কি অঘটন! কৌতুহলী মানুষগুলো পুলিশদের এমন ব্যবহারের কারণ জানতে চাইল। ওরা নারায়ণ-ঠাকুরকে যেমন যমের মত ভয় করে, তেমনি ভক্তি ও করে, অসুখ-বিসুখে ঠাকুরের কাছে এসেই যে পড়তে হয়।

এই সুযোগ নিতে নারায়ণ-ঠাকুর একটুও দেরি করেননি। ওদের ক্ষেপিয়ে তুলে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছেন।

ইতিমধ্যে ঝড়ের গতিতে গাঁয়ে নারায়ণ-ঠাকুরের গ্রেপ্তারের খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই শঙ্কিত গাঁয়ের মানুষগুলো পড়ি-মরি করে হাজির হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। হাজির হয়েছে ক্রোমাইটের খনির শ্রমিকরা। হাজির হয়েছেন প্রফুল্ল মিশ্র।

ধর্মীয় নেতারা এ-ভাবেই যুগ যুগ ধরে ধর্ম উন্মাদনার সৃষ্টি করে মানুষদের হিস্ট্রিরিয়া রোগী করে তোলে। একেই বলে গণ-হিস্ট্রিরিয়া —ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন আনন্দবাবু।

নিরঞ্জনবাবু শূন্যে দু-রাউণ্ড গুলি ছুড়লেন তাঁর রিভলভার থেকে। ক্ষিপ্ত জনতা পিছিয়ে গেল কিছুটা। কিন্তু তাদের ঘেরা তুলে নিল না।

নিরঞ্জনবাবু চেঁচালেন, "নারায়ণ খুন্টিয়া একজন খুনি, একজন প্রতারক। প্রতিবছর তোমাদের কোল খালি করে মানুষকে বলি চাপিয়েছে। প্রতি বছর পুজোর কয়েকটা দিন আতঙ্কে কাটে, এবার কার ছেলে যাবে ভেবে। আজ আমরা নারায়ণ খুন্টিয়াকে হাতে-নাতে ধরেছি। তোমরা খুনির কথায় বিশ্বাস করবে না। মানুষের রক্তে মাটি কখনও উর্বর হয় না। উর্বর করাতে লাগে ভাল সার, ভাল জলসেচ ব্যবস্থা, ভাল বীজ। নারায়ণ-ঠাকুর নিজের রোজগারের ধান্দায় তোমাদের ভুল বোঝাচ্ছে।"

"তাই যদি হয় তো কলা কাটা পড়ছে কি করে? ওটাও কি বুজরুকি?" প্রশ্নটা করলেন প্রফুল্ল মিশ্র।

প্রশ্নটা গ্রামের লোকেদের মনে ধরেছে। নিরঞ্জনবাবু বুঝলেন এবার গ্রামবাসীদের ওপর বলপ্রয়োগ ছাড়া উপায় নেই। ঠিক এমনি সময় এগিয়ে এলো পিংকি।

"আমি একই ভাবে কলা কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর আপনাদের সব্বাইকে শিখিয়ে দেব। আপনারাও পারবেন। একটা কলা এনে দিন, পাকা কলা।"

দু মিনিটের মধ্যে এসে গেল, একটার বদলে এক ছড়া। পিংকি নারায়ণ খুন্টিয়ার এক ছেলের কাপড়ের খুঁট থেকে কি যেন একটা

টেনে নিল। ছড়া থেকে ছিঁড়লো একটা কলা। তারপর বলল, "এক মিনিটের জন্য আমি এই ঘরে ঢুকছি। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন।"

ধৈর্য-ধরা সত্যিই কঠিন এই মুহূর্তে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় গ্রামের মানুষগুলো ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছে। সত্যিই কি ওই ছেলেটা দেখাতে পারবে গোটা খোসার ভেতরে কাটা কলা? কি করে দেখাবে? ও তো মায়ের কাছে বলি দেওয়া মানুষের রক্ত পান করেনি। ও কি করে কলা পড়ে দেবে? কলা পড়ার মন্ত্র জানলেই তো হয় না। ফি পুজোতে নরবলির রক্ত খেতে হয়। মন্ত্র জানলেই যদি হতো তবে তো নরবলি দেওয়ার প্রয়োজনই হতো না।

পিংকি এসে দাঁড়াল জনতার দরবারে। প্রত্যেকের দৃষ্টি এই মুহূর্তে পিংকির দিকে। বলতে কি, পিংকির হাতের দিকে। ওর হাতে একটা পাকা কলা।

পিংকি আহ্বান জানান, "আপনাদের মধ্যে থেকে একজন কেউ এগিয়ে আসুন।"

এগিয়ে এলেন প্রফুল্ল মিশ্র।

প্রফুল্লবাবুর হাতে কলাটা দিয়ে পিংকি বলল, "ভাল করে দেখুন তো, কলাটা গোটা আছে কি না?"

প্রফুল্ল অতি সতর্কতার সঙ্গে কলাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই আছে।"

"এবার খোসাটা ছাড়ান।"

প্রফুল্ল খোসা ছাড়াতে শুরু করলেন। এই মুহূর্তে আনন্দবাবু নিজের বুকের ধক্ ধক্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। উত্তেজনায় প্রতিটি মানুষই টানটান।

খোসা ছাড়ান হতেই—এ কি অবাক কাণ্ড? কলাটা পরিষ্কার দু-টুকরো করে কাটা। একটা টুকরো ডান হাতে তুলে ধরলেন প্রফুল্ল। বাঁ হাতে রয়েছে খোসা সমেত বাকি অর্ধেক কলা।

বিপুল জালোচ্ছ্বাসের মতই জনতার তুমুল উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, হৈ-

হৈ। পিংকি, প্রফুল্ল, নিরঞ্জনবাবু, অনন্তকুমার, আনন্দবাবু, দিব্যেন্দু-বাবু সব্বাই মিলে দু'হাত তুলে জনতাকে একটু চুপ করার আবেদন জানাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত নিরঞ্জনবাবু হুংকার ছাড়লেন, "আপনারা সবাই চুপ করুন। আপনারা গোটা কলা ভেতর থেকে কাটা থাকতে দেখলেন, কিন্তু কি করে কলা কাটা পড়ে জানতে হলে একটু চুপ করুন।"

কলা পড়ার কৌশল জানার আগ্রহে মুহূর্তে জনতা চুপ করল। পিংকি তার ডান হাতটা শূন্যে তুলে চেঁচাল, "আমি হাতের দু'আঙুলে কি ধরে আছি দেখতে পাচ্ছেন ?"

প্রফুল্লবাবু ও কাছের মানুষরা চেঁচালেন, "ছুঁচ।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই, ছুঁচ। এবার নিচ্ছি একটা কলা।" ছড়া থেকে একটা কলা ছিঁড়ল পিংকি।

"আপনারা যে কোনও কলার খোসার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন একটু উঁচু হয়ে থাকা কয়েকটা শির। এই শিরের যে কোনও একটায় ছুঁচটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি। ছুঁচটা ঢুকে গেল কলার মধ্যে। ঢোকানোর সময় একটু লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে ছুঁচটা যেন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে না যায়, অথচ ছুঁচটা প্রায় অন্য প্রান্তের খোসা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ-বার ছুঁচটা এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি! ফলে কি হলো ? পাকা কলার শাঁসটা দু'টুকরো হয়ে গেল। এখন ছুঁচটা বের করে নিচ্ছি।"

পিংকি এবার কলাটা এগিয়ে দিল প্রফুল্লবাবুর হাতে, "দেখুন তো, শিরগুলোর মধ্যে ছুঁচ ফোটানোর দাগটা খুঁজে পান কি না ?"

প্রফুল্লবাবু চেষ্টা করলেন, কিন্তু দাগের হদিশ পেলেন না। "না, কোনও দাগ নেই।"

পিংকি প্রফুল্লবাবুকে অনুরোধ করল, "এ-বার কলার খোসাটা ছাড়ান।"

ছাড়ালেন প্রফুল্লবাবু। খোসা ছাড়াতেই দেখা গেল ভেতর থেকে কলাটা দু-টুকরো হয়ে রয়েছে।

প্রফুল্ল দু'হাতে পিংকিকে তুলে ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, "তুমি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছ।"

পিংকি জনতার উদ্দেশ্যে চেঁচাল, "আপনারা প্রত্যেকে কলা কাটার রহস্যটা বুঝেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি।" বহু মানুষ চেঁচাল। তারপরই তারা ধেয়ে এলো নারায়ণ খুন্টিয়া ও তার দুই ছেলের দিকে।

নারায়ণ-ঠাকুর চেঁচালেন, "আমাদের বাঁচান। ওরা আমাদের মেরে ফেলবে।"

নারারণ-ঠাকুর ও তার দুই ছেলে লুকোতে চাইল পিংকিদের আড়ালে।

"কৌশলটা ধরলি কি করে?" আনন্দবাবু নীচু গলায় পিংকিকে জিজ্ঞেস করলেন।

"চার ছেলে আমাকে আটকে রাখা ঘরে বসেই কলা কাটা প্র্যাকটিস করেছে। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি মারা যাব ধরে নিয়ে আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্যই করেনি। এও দেখেছি, ছুঁচ থাকে ওদের ধুতির আঁচলে ফোঁড়া।"

"সোনার চাঁদ ছেলে আমার। তোর জন্যে আর কোন মা ছেলে হারাবে না রে।" ফুলমণি পরম স্নেহে পিংকিকে জড়িয়ে ধরে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলে।

আনন্দবাবুও তাঁর চোখের জলকে সামাল দিতে পারেন না।